অধ্যায় ১২

প্রাণীর আচরণ
(ANIMAL BEHAVIOUR)

প্রাচীনকাল থেকে মানুষের নিকট প্রাণীর আচরণ নিয়ে কৌতূহলের অন্ত নেই। আর এ কৌতূহল থেকেই জন্ম নিয়েছে প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার অভিলাষ এবং উন্মোচিত হয়েছে প্রাণিবিজ্ঞানের নতুন দ্বার 'প্রাণী আচরণ বিজ্ঞান' বা **Animal behaviour science**। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle, 384–322 BC) তাঁর 'Historia Animalium' গ্রন্থে প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত প্রথম তথ্য উপস্থাপন করেন। **উইলিয়াম হার্ভে** (William Harvey, 1578-1657) পাখির প্রজননকালীন আচরণ, বাসা নির্মাণ, ডিমে তা দেয়া ও অপত্য লালনের উপর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন। **চার্লস ডারউইন** (Charles Darwin) দেখিয়েছেন টিকে থাকার জন্য প্রকৃতি কীভাবে প্রাণীর বিশেষ আচরণকে সুবিধা দিয়ে থাকে। তাঁর বিখ্যাত 'The Expression of the Emotions of Man and Animals' গ্রন্থে মানুষ ও প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণার যে দিক নির্দেশনা দেয়া আছে তা আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের নিকট গ্রহণযোগ্য। এ অধ্যায়ে প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি
(Key words)

- ইথোলজি
- উদ্দীপক
- ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্ন
- সহজাত আচরণ
- ট্যাক্সিস
- প্রতিবর্ত ক্রিয়া
- অপত্য যত্ন
- শিখন আচরণ
- রাজকীয় জেলি
- অ্যালট্রুইজম

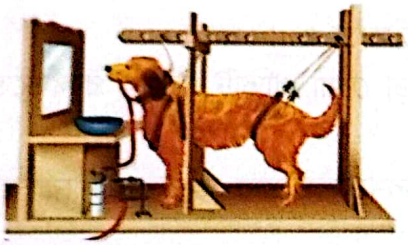
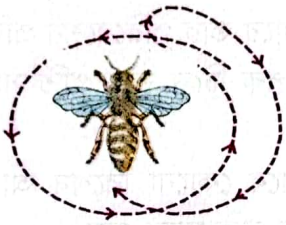

পিরিয়ড সংখ্যা ৮। এ অধ্যায় পাঠ শেষে ছাত্রছাত্রীরা যা পারবে-	
শিখনফল	**বিষয়বস্তু**
১। আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ২। সহজাত আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩। প্রত্যেক প্রাণীর (শীতের পাখির মাইগ্রেশন, মাকড়শার জাল, অপত্যের প্রতি যত্ন-মাছ, ব্যাঙ, পাখি) সহজাত আচরণ যাচাই করতে পারবে। ৪। শিখন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫। কুকুরের লালার প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (reflexes) উপর Pavlov এর পরীক্ষণ বর্ণনা করতে পারবে। ৬। মৌমাছির সামাজিক সংগঠন-এর আলোকে পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা (altruism) ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● আচরণের প্রকৃতি (The nature of behabiour) ○ উদ্দীপনায় আচরণগত পরিবর্তন ○ আচরণ ও বংশগতির মধ্যে সম্পর্ক ● সহজাত (Innate) আচরণ ○ ট্যাক্সিস (Taxes) ○ রিফ্লেক্সেস (Reflexes) ○ ইনসটিঙ্কস (Instincts) ● সহজাত আচরণ যাচাই ○ শীতের পাখির মাইগ্রেশন ○ মাকড়শার জাল ○ অপত্যের প্রতি যত্ন: মাছ, ব্যাঙ ও পাখি ● শিখন (Learning) ○ অভ্যাসগত (Habituation) ○ অনুকরণ (Imprinting) ● Pavlov এর পরীক্ষা: কুকুরের লালার প্রতিবর্তী ক্রিয়া ● সামাজিক আচরণ ○ পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা (Altruism)-মৌমাছির সামাজিক সংগঠন।

১২.১ আচরণের প্রকৃতি (The nature of behaviour)

বাহ্যিক কিংবা অভ্যন্তরীন উদ্দীপনার কারণে প্রাণিদেহে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার বহিঃপ্রকাশকে আচরণ বলে। প্রখ্যাত প্রাণী আচরণবিদ ম্যানিং (Manning, 1972) এর মতে "প্রাণীর আচরণের মধ্যে সেসব প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত যাদের মাধ্যমে প্রাণী তার বাহ্যিক পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, দেহের অভ্যন্তরের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হয় এবং তার চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া করে"। প্রাণীর আচরণের বিবর্তনিক ও প্রায়োগিক গুরুত্বের বিজ্ঞান ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করার বিজ্ঞানকে ইথোলজি (Ethology; Gr. *ethos*=behaviour + *logos*=knowledge) বলে। ডাচ আচরণবিদ নিকো টিনবার্জেন (Niko Tinbergen) কে ইথোলজির জনক বলা হয়।

কার্ল ফন ফ্রিস (Karl Von Frisch, 1886-1982), কনরেড লরেঞ্জ (Konrad Lorenz, 1903-1989) ও নিকো টিনবার্জেন (Niko Tinbergen, 1907-1988) কে ইথোলজির প্রধান স্থপতি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ তিনজন বিজ্ঞানী প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাণীর আচরণের উপর অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁদেরকে 1973 সালে শারীরবিজ্ঞান ও মেডিসিনে নোবেল পুরষ্কার প্রদান করা হয়।

কার্ল ফন ফ্রিস
(1886-1982)

কনরেড লরেঞ্জ
(1903-1989)

নিকো টিনবার্জেন
(1907-1988)

প্রাণীর আচরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristic of animal behaviour)

১। আচরণের দ্বারা প্রাণী দ্রুত ও সুবিধাজনক উপায়ে তার পরিবেশের প্রতি সাড়া প্রদান করে।

২। প্রাণীর আচরণ অভিযোজনিক; কোনো উদ্দীপক চিনে তার প্রতি সাড়া দেয়া প্রতিটি প্রাণীর প্রকৃতিতে টিকে থাকার একটি প্রধান উপায়।

৩। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন উদ্দীপক সম্মিলিতভাবে কোনো বিশেষ আচরণকে সক্রিয় করে। প্রাণীর অধিকাংশ আচরণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন উভয় ধরনের উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়।

৪। প্রাণীর কিছু আচরণ চক্রাকারে সংঘটিত হয়। এটি দৈনিক, মাসিক, ঋতুভিত্তিক বা বর্ষভিত্তিক হতে পারে। জীবের প্রাত্যহিক চক্রকে দৈনিক ছন্দোময়তা (circadian rhythm) বলে যা একটি জৈবিক ঘড়ি (biological clock) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫। জিনের গঠন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা উভয়ের দ্বারা প্রাণীর আচরণ প্রভাবিত হয়।

৬। প্রাণীর আচরণে সহজাত এবং শিখন উভয় ধরনের উপাদান থাকে।

৭। প্রাণীর আচরণ অভিযোজনিক; প্রাণী যা কিছু শিখে নতুন পরিবেশে তা ভালোভাবে অভিযোজিত হয়।

৮। সকল ধরনের আচরণের মূল্য ও সুবিধা আছে। প্রাণীর আচরণের যে কোনো মূল্যে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা অর্জিত হয়। প্রতিটি সদস্যের অতিরিক্ত সুবিধা লাভের জন্য অনেক প্রাণীতে সমাজবদ্ধ (Society) কিংবা যুথবদ্ধ (Courtship) হওয়ার আচরণ বিকশিত হয়েছে।

৯। সাধারণত একই প্রজাতির সদস্য সমাজবদ্ধ হওয়ার আচরণ প্রদর্শন করে তবে অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যেও সমাজবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

১০। মানুষ ব্যতিত অন্যান্য কিছু প্রাণীর আচরণ প্রদর্শনের জন্য জটিল বোধন ক্ষমতার (cognitive abilities) প্রয়োজন হয়। এ বোধন ক্ষমতা প্রাণীকে সামাজিক জীবনে অভিযোজনের কিছু সুবিধা এনে দেয়।

উদ্দীপনায় আচরণগত পরিবর্তন

উদ্দীপক (stimulus, pl. stimuli) হলো বহিঃ ও অন্তঃপরিবেশের এমন কোনো পরিবর্তন যা প্রাণীর আচরণে সাড়া সৃষ্টি করে। এটি কোনো বস্তু বা ঘটনা বা অন্য কোনো প্রভাবক হতে পারে যা প্রাণী তার সংবেদী ইন্দ্রীয় দ্বারা

গ্রহণ করে। কোনো প্রাণী বা এর কোনো অঙ্গের কোনো উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়ার ক্ষমতাকে সংবেদনশীলতা (sensitivity) বলে। আলো, তাপ, শব্দ, গন্ধ, খাদ্য ইত্যাদি উদ্দীপক দ্বারা প্রাণীতে সংবেদন (sensetion) সৃষ্টি হয়। প্রতিটি উদ্দীপক সংবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণীর সুনির্দিষ্ট আচরণে পরিবর্তন আনে।

কোনো উদ্দীপকের উপস্থিতিতে প্রাণী যে রকম আচরণ করে এর অনুপস্থিতিতে সে রকম আচরণ করে না। সুনির্দিষ্ট উদ্দীপক প্রাণীকে বিশেষ আচরণ প্রদর্শনের সুযোগ বৃদ্ধি করে দেয়। অনেক বিজ্ঞানীর মতে প্রাণীর সকল আচরণই বিভিন্ন উদ্দীপক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্দীপক নিয়ন্ত্রিত আচরণের প্রধান চারটি নীতি হলো-

- ❑প্রাণী খুব দ্রুত উদ্দীপকের উপস্থিতি বুঝতে পারে যার প্রতি সাড়া দিয়ে আচরণের দ্রুত পরিবর্তন ঘটায়।
- ❑সুনির্দিষ্ট উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে প্রাণী কখনোও আচরণ প্রদর্শন করে না।
- ❑সুনির্দিষ্ট উদ্দীপক ছাড়া অন্য কোনো উদ্দীপকের প্রভাবে প্রাণী আচরণ প্রদর্শন করে না।
- ❑নির্দিষ্ট উদ্দীপক দ্বারা প্রাণীর নির্দিষ্ট আচরণ প্রদর্শিত হয়।

সংবেদন সৃষ্টিতে উদ্দীপক, ইন্দ্রিয় অঙ্গ, নিউরন ও মস্তিষ্ক একযোগে কাজ করে। কোনো ইন্দ্রিয় অঙ্গ কোনো উদ্দীপনা গ্রহণ করলে সেটি অন্তর্মুখী নিউরনের মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় যা সেখানে একটি সংবেদন সৃষ্টি করে।

উদ্দীপক প্রাণীর আচরণে কোনো না কোনো ভাবে পরিবর্তন আনে। প্রাণীতে কিছু উদ্দীপক বছরের নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায়। অনেক প্রাণী কেবল বসন্তে যৌন মিলন ঘটায়। অনেক প্রজাতির প্রাণী বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীকে আকর্ষণ করার জন্য তাদের আচরণের অনেক পরিবর্তন ঘটায়। বিশেষ করে পাখিতে এ বৈশিষ্ট্য বেশি দেখা যায়। এদের অনেক প্রজাতির পুরুষ বসন্তকালে স্ত্রীকে আকর্ষণের জন্য গান গায়। প্রতিটি প্রজাতির নিজস্ব গানের সুর আছে যা এদের স্ত্রীকে আকর্ষণ করে। প্রজনন ঋতুতে কিছু পাখির পুরুষ সদস্যের দেহে নতুন ধরনের রঙিন পালক বিকশিত হয় যা দেখে এদের স্ত্রীরা আকর্ষিত হয়। প্রাণীর অধিকাংশ উদ্দীপকই সুনির্দিষ্ট এবং এগুলো খুব দ্রুত আচরণের পরিবর্তন ঘটায়।

অধিকাংশ প্রাণী একাধিক ধরনের উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়। প্রাণী প্রধানত চার ধরনের উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিয়ে আচরণের পরিবর্তন ঘটায়। এগুলো হলো-

১। রাসায়নিক উদ্দীপক (Chemical stimuli): বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রাণীরা বায়ুতে বা পানিতে খুব অল্প পরিমাণে রাসায়নিক উদ্দীপকের নিঃসরণ ঘটায়। এগুলো প্রজাতি নির্দিষ্ট। প্রাণীর যৌন মিলন, সীমানা নির্ধারণ, গমন পথ চিহ্নিতকরণ, শাবক শনাক্তকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন আচরণে রাসায়নিক উদ্দীপক ব্যবহৃত হয়। সেক্স ফেরোমন (Sex pheromone) একটি রাসায়নিক উদ্দীপক যা দ্বারা প্রাণী বিশেষ করে স্ত্রী প্রাণী বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীকে আকর্ষণ করে।

২। শব্দ উদ্দীপক (Sound stimuli): শব্দ প্রাণীর অন্যতম প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম। এ উদ্দীপনায় প্রাণীর আচরণের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। সাধারণত দূরে অবস্থানকারী সদস্যের সাথে যোগাযোগ করার জন্য শব্দ উদ্দীপক ব্যবহৃত হয়। প্রাণীর যৌন মিলন, শিকারী হতে সতর্ক করা, স্বজাতি শনাক্তকরণ, খাদ্যের প্রাচুর্যের সংবাদ দেয়া ইত্যাদি বিভিন্ন আচরণে শব্দ উদ্দীপক ব্যবহৃত হয়।

৩। দর্শন উদ্দীপক (Visual stimuli): দেখতে সক্ষম প্রাণীর ক্ষেত্রে আলোক একটি উত্তম যোগাযোগ মাধ্যম। নিশাচর প্রাণীরা সাধারণ আলোতে দেখে না কিন্তু তারা আলোর অবলোহিত (infrared) তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তু শনাক্ত করে। মরুভূমির সাপ রাতের বেলায় এ পদ্ধতিতে উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী শিকার করে। গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী অনেক মাছ এবং কিছু পতঙ্গের আলোক উৎপাদনকারী অঙ্গ আছে যা তাদের চলাচল, শিকার ধরা ও প্রজননের কাজে ব্যবহৃত হয়। অনেক প্রাণী যেমন- বানর, হাতি, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি তাদের অঙ্গ-ভঙ্গি দ্বারা বিভিন্ন রকম আচরণ প্রদর্শন করে সমগোত্রীয় কিংবা অন্য প্রজাতির সদস্যদের আকর্ষণ করে। পাখি তার বাচ্চার হা করা মুখ দেখে দ্রুত সাড়া দিয়ে মুখে খাবার ফেলে।

চিত্র ১২.১ দর্শন উদ্দীপক

৪। স্পর্শ উদ্দীপক (Touch stimuli): প্রাণিজগতের বিভিন্ন প্রজাতিতে স্পর্শ উদ্দীপকের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। শারীরিক সংযোগের দ্বারা স্পর্শ উদ্দীপক প্রাণীর আচরণে পরিবর্তন ঘটায়। কিছু পতঙ্গভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং জেলি ফিস স্পর্শ উদ্দীপক দ্বারা তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে। অনেক পতঙ্গভোজী স্তন্যপায়ীর (যেমন-চিকা) তুণ্ডে এমন লোম থাকে যা দ্বারা এরা 0.1 মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের খাদ্যকেও শনাক্ত করতে পারে। সামাজিক পতঙ্গ মৌমাছির কর্মীগুলো তরুণ মৌমাছির অ্যান্টিনার সংস্পর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

আচরণ ও বংশগতির মধ্যে সম্পর্ক

স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন (Sir Francis Galton, 1822-1911) নামক একজন বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম প্রাণীর আচরণ ও বংশগতির উপর বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করেন। প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত বংশগতিবিদ্যা জীববিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা যেখানে প্রাণীর আচরণে জিন ও পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে অধ্যয়ন করা হয়।

আচরণের জীবতাত্ত্বিক ভিত্তি (Biological basis of behaviour)

১। প্রাণীর আচরণ প্রজাতি নির্দিষ্ট (species specific)। যৌন আচরণে এ বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোনো একটি প্রজাতির প্রাণীতে যে ধরনের যৌন আচরণ দেখা যায় তার অতি নিকট সম্পর্কীয় প্রাণীতে সে ধরনের আচরণ দেখা যায় না। আচরণের পার্থক্য দ্বারা অনেক সিবলিং প্রজাতির (দুটি প্রজাতি দেখতে প্রায় একইরকম) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। প্রাণীর আচরণের এ ধরনের বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।

২। প্রাণীর আচরণ বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। প্রাণীর সকল সহজাত আচরণ হাজার বছর ধরে এক জনু (generatrion) থেকে অন্য জনুতে অপরিবর্তিত অবস্থায় সঞ্চারিত হয়।

৩। প্রাণীর কোনো অঙ্গ বা প্রক্রিয়ায় জৈবিক পরিবর্তন দ্বারা আচরণের পরিবর্তন ঘটে। যেমন নিয়মিত ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে মানসিক রোগীর মস্তিষ্কের রসায়ন পরিবর্তন করে বিকৃত আচরণকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা যায়।

৪। মানুষের কিছু আচরণ পরিবারের মধ্যে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। যেমন, অনেক পরিবারে মানসিক রোগী ধারাবাহিকভাবে দেখা যায়।

৫। প্রাণীর প্রতিটি আচরণের একটি বিবর্তনিক ইতিহাস থাকে যার ফলে অনেক আচরণ নিকটতম কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যেমন, জিনের গঠন থেকে শিম্পাঞ্জি মানুষের অত্যন্ত ঘনিষ্ট। মাত্র 2% জিন দ্বারা এরা মানুষ হতে আলাদা। এজন্য অনেক সামাজিক আচরণ যেমন- সন্তান বাৎসল্য, পরস্পরের সহযোগিতা, নেতৃত্ব প্রভৃতিতে শিম্পাঞ্জি ও মানুষের মিল পাওয়া যায়।

জিন কীভাবে আচরণকে প্রভাবিত করে?

প্রাণীর আচরণ কোনো একক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বিভিন্ন লোকাসে অবস্থিত একাধিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে আচরণ প্রাণীর একটি জটিল বৈশিষ্ট্য। গবেষণায় দেখা গেছে একটি জিনের অতিমাত্রায় প্রকাশ ইঁদুরের শিখন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এ ধরনের জিনকে বিজ্ঞানীরা শিখন জিন (learning gene) বা স্মার্ট জিন (smart gene) নাম দিয়েছেন।

প্রাণীর জিন নির্ধারিত যেসব আচরণধারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদর্শিত হয় এবং প্রজাতির অপর কোনো সদস্যকে না দেখেই বা অন্যের নিকট থেকে না শিখেই প্রকাশিত হয় তাকে নির্ধারিত ক্রিয়া ধারা বা ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্ন (fixed action pattern-FAP) বলে। এরূপ পরিস্থিতিতে একই বয়সের ও একই লিঙ্গের কোনো প্রাণীকে স্বগোত্রীয় অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখলেও অজান্তেই এরূপ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রাণিজগতে আচরণের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যেখানে একই প্রজাতির সকল সদস্যের মধ্যে বিশেষ আচরণ প্রত্যক্ষ করা যায় এবং উক্ত আচরণ পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ নয় কিংবা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত নয়। এসব আচরণ নির্ধারিত ক্রিয়া সংশ্লিষ্ট বা FAP কেন্দ্রিক।

FAP কেন্দ্রিক আচরণ জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে এটি প্রাণীর জিনোমে পুর্বানুক্রমিত (preprogrammed) অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে। তাই এটি প্রজাতি নির্দিষ্ট যা প্রজাতির স্মৃতি (species memory) হিসেবে এক জনু থেকে অন্য জনুতে সঞ্চারিত হয়। প্রাণীর যুগলবন্দি ও মৈথুন (courtship and mating), খাদ্যান্বেষণ (foraging), অভিপ্রয়ান (migration), বাসা তৈরি (nesting), খাদ্য মজুত গড়ে তোলা (hoarding) ইত্যাদি FAP আচরণের

অর্ন্তগত। প্রজনন ঋতুতে ময়ূরের পেখম মেলে নাচ তাকে কেউ শিখায়নি বা স্বগোত্রীয় কোনো সদস্যকে দেখেও শিখেনি। বাবুই পাখির বাসা তৈরিতে কিংবা মাকড়শার জাল বুননের কোনো শিখনের প্রয়োজন হয় না কিংবা মৌমাছির সামাজিক আচরণের কোনো শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

গ্রেল্যাগ হাঁস (greylag goose) মাটির অগভীরে গর্ত করে বাসা তৈরী করে। দৈবাত এ বাসা থেকে ডিম গড়িয়ে দূরে সরে গেলে প্রথমে চঞ্চুর সাথে ডিমকে স্পর্শ করে। এরপর চঞ্চুর ভেতরের তল দিয়ে ডিমকে ঠেলতে থাকে। অবশেষে চঞ্চু বাঁকা করে ধাপে ধাপে ডিমকে ঠেলতে ঠেলতে বাসায় স্থাপন করে। এগুলো সবই জিন নিয়ন্ত্রিত আচরণ যা প্রাণীর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পুর্বানুক্রমিত থাকে।

চিত্র ১২.২ গ্রেল্যাগ হাঁসের সরে যাওয়া ডিমকে বাসায় ফিরিয়ে আনার কৌশল

কুকুর ও নেকড়ে বিভিন্ন পরিস্থিতে তাদের লেজের অবস্থান ও মুখোভঙ্গির প্রদর্শনের মাধ্যমে FAP আচরণ প্রদর্শন করে।

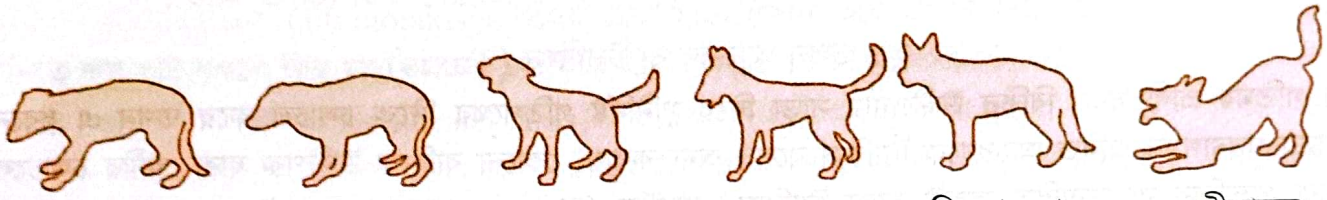

চিত্র ১২.৩ কুকুরের লেজ ও মুখোভঙ্গি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আচরণ প্রদর্শন

১২.২ সহজাত আচরণ (Innate behaviour)

অনেকগুলো প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় সৃষ্ট সরল, পূর্ব অভিজ্ঞতা বর্জিত, প্রজাতি সুনির্দিষ্ট (species specific), শিখনবিহীন ও বংশগত আচরণকে সহজাত আচরণ বলে। অন্য কথায় একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রাণী কোনোরকম শিক্ষা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে বা আত্মরক্ষার তাগিদে বংশ পরম্পরায় একইভাবে যেসব জন্মগত অপরিবর্তনীয় আচরণ প্রদর্শন করে তাকে সহজাত আচরণ বলে।

সহজাত আচরণের বৈশিষ্ট্য

১। সহজাত আচরণ প্রজাতি নির্দিষ্ট; একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যের মধ্যে একই ধরনের সহজাত আচরণ পরিলক্ষিত হয়।

২। সহজাত আচরণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং জিন নিয়ন্ত্রিত। এগুলো প্রাণীর জিনোমে পুর্বানুক্রমিত অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে।

৩। জন্মগত হলেও সব সহজাত আচরণ জন্মের সময় থেকে আত্মপ্রকাশ করে না। পরিপক্কতার মধ্য দিয়ে উপযুক্ত সময়ে তাদের বিকাশ ঘটে।

৪। সহজাত আচরণ বংশ পরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সহজাত আচরণকে প্রভাবিত করে।

৫। সহজাত আচরণ শিখনের প্রয়োজন হয় না, এটি প্রাণীতে জন্মগতভাবে অর্জিত হয়।

৬। সহজাত আচরণ প্রাণীর জৈবিক প্রয়োজন অনুসারে বিকশিত হয়; এটি খাদ্যগ্রহণ, বাসা নির্মাণ, আত্মরক্ষা, প্রজনন বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহায়তা দান করে।

৭। অপেক্ষাকৃত জটিল ক্রিয়ার মাধ্যমে সহজাত আচরণ আত্মপ্রকাশ করে।

প্রাণিজগতের বিভিন্ন স্তরে সহজাত আচরণের গুরুত্ব একরকম নয়। তাই বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন রকম সহজাত আচরণ দেখা যায়। প্রাণিজগতে নিম্নলিখিত ধরনের সহজাত আচরণ সচরাচর দেখা যায়:

১। বিগ্রহ আচরণ (Fighting behaviuor): পাখি ও স্তন্যপায়ীর প্রজনন স্থান নির্ণয়ে দেখা যায়।

২। যুগলবন্দি ও মৈথুন আচরণ (Courtship and mating behaviuor): পতঙ্গ ও পাখিদের যৌন মিলনের সময় দেখা যায়।

৩। বাৎসল্য আচরণ (Parental care behaviuor): মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজননের সময় দেখা যায়।

৪। অভিপ্রয়ান আচরণ (Migratory behaviuor): পতঙ্গ, মাছ ও পাখিতে দেখা যায়।

৫। সঞ্চয় আচরণ (Hoarding behaviuor): কীট-পতঙ্গ, ইঁদুর ইত্যাদিতে দেখা যায়।

বিগ্রহ আচরণ

যুগলবন্দি ও মৈথুন আচরণ

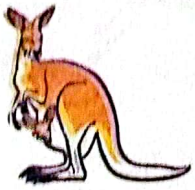
বাৎসল্য আচরণ

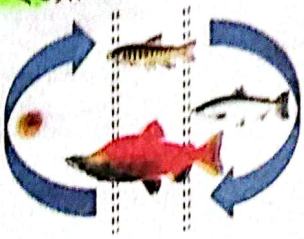
অভিপ্রয়ান আচরণ

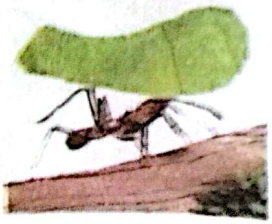
সঞ্চয় আচরণ

সহজাত আচরণের উদাহরণ: ট্যাক্সিস, প্রতিবর্ত ক্রিয়া, স্বভাবজাত আচরণ

১২.২.১ চলন আচরণ বা ট্যাক্সিস (Taxis)

সচল গতিময় প্রাণী যখন বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে সুনির্দিষ্ট গতিপথের দিকে চলাচল করে তখন এ ধরনের স্থানান্তরে গমনাগমন জনিত আচরণকে ট্যাক্সিস বলে। অন্য কথায়, কোনো বাহ্যিক উদ্দীপক দ্বারা প্রাণীর চলাচলের গতিকে প্রভাবিত বা ত্বরান্বিত করাই হলো ট্যাক্সিস। হার্টেজ (Herter, 1927), সেলয়ট (Cellyot ,1936), টিনবার্জেন (Tinbergen, 1951) প্রমুখ প্রাণিবিদ প্রাণীর ট্যাক্সিস নিয়ে গবেষণা করেছেন।

ট্যাক্সিস-এর বৈশিষ্ট্য (Charateristics of taxis)

১। ট্যাক্সিস প্রাণীর এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় অভিযোজন।

২। ট্যাক্সিস এর প্রধান শর্ত হলো প্রাণীর নড়ন ও উদ্দীপনার দিকে বা উল্টাদিকে স্থান পরিবর্তন।

৩। প্রাণীর চলনের দিক সর্বদা বহিঃউদ্দীপনা দ্বারা পচিালিত হয়।

৪। প্রাণীর সুনির্দিষ্ট দিকের চলন সরাসরি উদ্দীপনা শক্তির সমানুপাতিক।

ট্যাক্সিস এর প্রকার (Types of taxis)

ট্যাক্সিস ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে। কোনো উদ্দীপকের অভিমুখে গমনকে ধনাত্মক ট্যাক্সিস (posistiv etaxis) এবং বিপরীতমূখী গমনকে ঋণাত্মক ট্যাক্সিস (negative taxis) বলে।

■ **উদ্দীপনার উৎসের উপর ভিত্তি করে ট্যাক্সিস নিম্নলিখিত ধরনের**

১। ফটোট্যাক্সিস (Phototaxis): আলোক উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে প্রাণীর স্থানান্তরকে ফটোট্যাক্সিস বলে। আলোর উৎসের প্রতি আকর্ষণকে ধনাত্মক এবং বিকর্ষণকে ঋণাত্মক ফটোট্যাক্সিস বলে। যেমন- আলোর প্রতি উইপোকা ধনাত্মক এবং আরশোলা ঋণাত্মক ফটোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

২। থার্মোট্যাক্সিস (Thermotaxis): তাপীয় উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে প্রাণীর যে স্থানান্তর ঘটে তাকে থার্মোট্যাক্সিস বলে। *Euglena, Amoeba, Paramecium* ইত্যাদি এককোষী জীব অধিক উত্তাপ থেকে সর্বদা দূরে সরে গিয়ে থার্মোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

৩। কেমোট্যাক্সিস (Chemotaxis): রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতি সাড়া দিয়ে প্রাণীর গমনাগমনকে কেমোট্যাক্সিস বলে। যেমন, *Paramecium* অনেক রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতি ঋণাত্মক সাড়া প্রদান করে তবে মৃদু অ্যাসিডের প্রতি এরা ধনাত্মক কেমোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

৪। থিগমোট্যাক্সিস (Thigmotaxis): যখন কোনো প্রাণী তার চলার পথে স্পর্শ ইন্দ্রিয় দ্বারা স্থানান্তরে অনুপ্রাণিত হয় তখন তাকে থিগমোট্যাক্সিস বলে। এটি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে।

৫। হাইড্রোট্যাক্সিস (Hydrotaxis): আর্দ্রতা যখন প্রাণীর চলাচলকে প্রভাবিত করে তখন তাকে হাইড্রোট্যাক্সিস বলে। যেমন- কেঁচোর সবসময় ভেজা মাটির দিকে গমন।

৬। অ্যানিমোট্যাক্সিস (Anemotaxis): বায়ুপ্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রাণীর চলাচলকে অ্যানিমোট্যাক্সিস বলে। বায়ুপ্রবাহের অনুকূলে প্রাণীর গমনকে ধনাত্মক এবং প্রতিকূলে গমনকে ঋণাত্মক অ্যানিমোট্যাক্সিস বলে।

৭। রিওট্যাক্সিস (Rheotaxis): পানি প্রবাহ বা স্রোতের প্রতি সাড়া দিয়ে প্রাণীর স্থানান্তরকে রিওট্যাক্সিস বলে। যেমন- কার্প জাতীয় মাছ প্রজননের সময় পানিস্রোতের বিপরীতে চলে ঋণাত্মক রিওট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

৮। জিওট্যাক্সিস (Geotaxis): মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রাণীর চলাচলকে জিওট্যাক্সিস বলে। খাদ্যের সন্ধানে ক্যাটারপিলার লার্ভা উপরের দিকে এবং এদের পিউপা নিচের দিকে গমন করে যথাক্রমে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক জিওট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

৯। গ্যালভানোট্যাক্সিস (Galvanotaxis): বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে প্রাণীর স্থানান্তরকে গ্যালভানোট্যাক্সিস বলে। যেমন- চিংড়িধারী কোনো অ্যাকুরিয়ামে দূর্বল তড়িৎপ্রবাহ চালানো হলে সকল চিংড়ি অ্যাকুরিয়ামের ধনাত্মক (অ্যানোড) প্রান্তের দিকে ছুটতে থাকে।

১০। ফনোট্যাক্সিস (Phonotaxis): শব্দের প্রতি সাড়া প্রদান করে প্রাণীর চলাচলকে ফনোট্যাক্সিস বলে। পানিতে শব্দ সৃষ্টি করলে কিছু মাছ ধনাত্মক এবং কিছু মাছ ঋণাত্মক ফনোট্যাক্সিস প্রদর্শন করে।

১১। সাপেক্ষ ট্যাক্সিস (Conditional taxis): যখন কোনো প্রাণী একই সময়ে দুই বা ততোধিক ট্যাক্সিস প্রদর্শন করে তখন তাকে সাপেক্ষ ট্যাক্সিস বলে। যেমন- কিছু প্রজাপতি ডিম পাড়ার জন্য বিশেষ উদ্ভিদের গন্ধ ও সবুজ পাতার দিকে গমন করে।

■ সুনির্দিষ্ট গতিপথের বা দিকমুখিতার ভিত্তিতে ট্যাক্সিস 5 ধরনের

১। ক্লাইনোট্যাক্সিস (Klinotaxis): উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে কোনো প্রাণীর আংশিক বা সমগ্র দেহের পার্শ্বীয় সঞ্চালন দ্বারা স্থিতি হওয়ার আচরণকে ক্লাইনোট্যাক্সিস বলে। এক্ষেত্রে প্রাণীর কোনো জোড় সংবেদ অঙ্গ থাকে না বরং একটি প্রবল সংবেদী অঙ্গ দ্বারা উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। ইউগ্লিনা, মাছির লার্ভা, প্রজাপতির ক্যাটারপিলার, কেঁচো ইত্যাদি প্রাণীতে ক্লাইনোট্যাক্সিস দেখা যায়।

২। মেনোট্যাক্সিস (Menotaxis): আলোর অবিরাম উৎসের প্রতি সাড়া দিয়ে প্রাণীর কৌণিক (angular) দিক পরিবর্তনকে মেনোট্যাক্সিস বলে। যেমন- সামুদ্রিক শামুক *Elysia viridis* সূর্যের দিক পরিবর্তনের সাথে 45° থেকে 135° পর্যন্ত অবস্থান পরিবর্তন করে। পিপড়া ও মৌমাছি সূর্যের প্রতি সাড়া দিয়ে এ ধরনের চলন প্রদর্শন করে।

৩। নেমোট্যাক্সিস (Mnemotaxis): প্রাণীর স্মৃতিমূলক (গ্রিক *mnemo*=স্মৃতি) সাড়াদানের মাধ্যমে চলনকে নেমোট্যাক্সিস বলে। অভিপ্রয়ানি পাখি, মাছ ও পতঙ্গ চলার পথের বিভিন্ন চিহ্নকে মনে রেখে স্মৃতির মাধ্যমে চলাচল করে। মানুষের চলনেও নেমোট্যাক্সিস দেখা যায়।

৪। টেলোট্যাক্সিস (Telootaxis): তুলনামূলক তীব্র উদ্দীপনার প্রতি সাড়া দিয়ে প্রাণীর চলনকে টেলোট্যাক্সিস বলে। যেমন- মৌমাছি যখন খাদ্যের সন্ধানে বাসা থেকে বের হয় তখন এরা আলোর উদ্দীপক সূর্য এবং খাদ্যের উদ্দীপক ফুলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে, কিন্তু ফুলের উদ্দীপনার তীব্রতা অধিক হওয়ায় এরা ফুলের দিকে গমন করে। এ ধরনের চলনে প্রাণীর জোড় সংবেদী অঙ্গ থাকে।

৫। ট্রপোট্যাক্সিস (Tropotaxis): যখন প্রাণী কোনো উৎস থেকে বিভিন্ন তীব্রতার উদ্দীপনাকে জোড় গ্রাহক অঙ্গ দ্বারা বিশ্লেষণ করে ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে চলাচল করে তখন তাকে ট্রপোট্যাক্সিস বরে। এ ধরনের ট্যাক্সিসের ফলে প্রাণী পাশের দিকে চলতে পারে। মাছের উকুন ও গ্রেইং প্রজাপতিতে এধরনের ট্যাক্সিস দেখা যায়।

ট্যাক্সিস এর গুরুত্ব

ট্যাক্সিস প্রাণীদের স্থানান্তর গমন জনিত আচরণ। কিছু উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে প্রাণীর ট্যাক্সিস ঘটে। নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতিকূলে বা অনুকূলে সাড়া দিয়ে এরা প্রকৃতিতে সুবিধাজনক অবস্থানে স্থানান্তরিত হয়। প্রাণীদের ট্যাক্সিস আচরণ এদেরকে প্রকৃতিতে টিকে থাকতে সহায়তা করে।

১২.২.২ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflexes)

কোনো সংবেদী উদ্দীপনার প্রতি স্বয়ংক্রিয় ও আকস্মিক সাড়া দেয়াকে **প্রতিবর্ত ক্রিয়া** বলে। জীবনের জরুরী অবস্থার সাথে মোকাবেলা করার জন্য প্রাণী বিচার বিবেচনা না করে বাহ্যিক উদ্দীপকের ক্রিয়ার ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ ধরনের ক্রিয়া মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে স্নায়ুতন্ত্রের সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন-আগুণে হাত পড়লে সঙ্গে সঙ্গে হাত সরে আসা, চোখে কিছু পড়লে আপনা থেকেই চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়া, পায়ে কাঁটা ফুটলে অতি ক্ষিপ্রতার সাথে পা সরিয়ে নেয়া ইত্যাদি।

প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য

- এটি সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক ধরনের প্রতিক্রিয়া, এর পেছনে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা থাকে না।
- এটি সহজে সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয় না; এক ধরনের উদ্দীপক এক ধরনের প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে।
- প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত বা জন্মগত, শিক্ষালব্ধ নয়।
- এটি সহজ প্রকৃতির।
- প্রতিবর্ত ক্রিয়া খুব দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়; সংবেদনের সাথে সাথেই দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া সংঘটন প্রক্রিয়া

যে পথে প্রতিবর্তি ক্রিয়া সংঘটিত হয় তাকে **প্রতিবর্ত চক্র** (reflex arc) বলে। প্রতিবর্ত চক্রের নিম্নলিখিত অংশগুলো থাকে:

১। **গ্রাহক** (Receptor): এটি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার জন্য সংবেদী উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এর সাথে একটি সংবেদী স্নায়ু সংযুক্ত থাকে।

মানুষের কয়েকটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া
- ❑ চোখের উপযোজন
- ❑ হাঁটুর ঝাঁকুনি
- ❑ চোখের পিউপিলের সঞ্চালন
- ❑ হাঁচি
- ❑ কনুই ঝাঁকুনি
- ❑ হাই তোলা

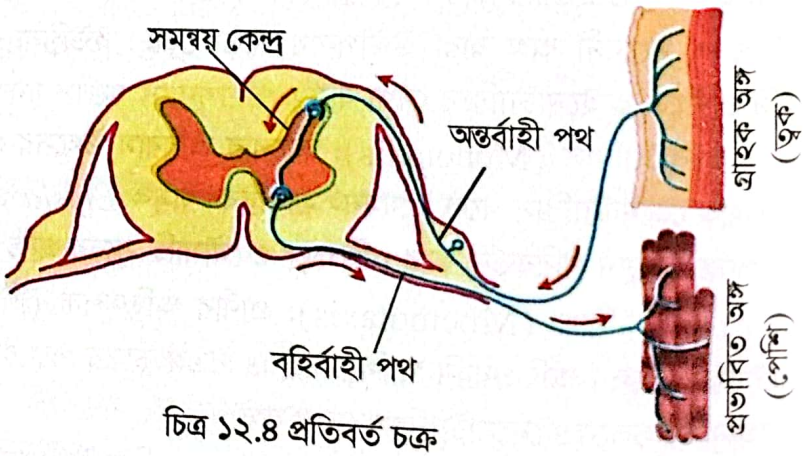

চিত্র ১২.৪ প্রতিবর্ত চক্র

২। **অন্তর্বাহী পথ** (Afferent path): এটি একটি সংবেদী স্নায়ু (sensory nerve)। এর মাধ্যমে অন্তর্গামী স্নায়ু উদ্দীপনা ক্রিয়া বিভবরূপে (action potential) কেন্দ্রে প্রেরিত হয়।

৩। **সমন্বয় কেন্দ্র** (Integration center): এটি প্রকৃতপক্ষে সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থিত একটি সাইন্যাপস যার মাধ্যমে অন্তর্বাহী স্নায়ু উদ্দীপনা মোটর নিউরনে পরিবাহিত হয়।

৪। **বহির্বাহী পথ** (Efferent path): এটি একটি আজ্ঞাবাহী স্নায়ু (motor nerve)। এর মাধ্যমে বহির্গামী স্নায়ু উদ্দীপনা কেন্দ্র থেকে প্রভাবিত অঙ্গে প্রেরিত হয়।

৫। প্রভাবিত অঙ্গ (Effector): এটি একটি পেশি বা একটি গ্রন্থি হতে পারে যা যথাক্রমে সঙ্কোচন বা নিঃসরণের মাধ্যমে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রভাব প্রদর্শন করে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রকারভেদ

প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়, যেমন-

(ক) সৃষ্টির ধরন অনুযায়ী প্রতিবর্ত ক্রিয়া দুপ্রকার:

১। অনপেক্ষ প্রতিবর্ত (Non-conditional reflex): বাহ্যিক উদ্দীপক প্রয়োগের সাথে সাথে প্রাণিদেহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাকে অনপেক্ষ বা সরল প্রতিবর্ত বলে। এগুলো সহজাত প্রতিবর্ত। যেমন– হাঁটুর ঝাঁকুনি।

২। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (Conditional reflex): এগুলো অর্জিত প্রতিবর্ত। শিখন বা শর্ত সাপেক্ষে এগুলো অর্জিত হয়। যেমন- পরিচিত টক খাবারের কথা শুনলেই মুখে লালা আসে কিন্তু অপরিচিত টক খাবার দেখলেও লালা আসে না।

(খ) উদ্দীপনা স্থানের অবস্থান অনুযায়ী প্রতিবর্ত ক্রিয়া দুই প্রকার-

১। অগভীর প্রতিবর্ত (Superficial reflex): যখন স্নায়ু উদ্দীপক দেহের অগভীর স্থানকে (ত্বক) উদ্দীপিত করে।

২। গভীর প্রতিবর্ত (Deep reflex): যখন স্নায়ু উদ্দীপক দেহের গভীর স্থানকে (টেনডন) উদ্দীপিত করে।

১২.২.৩ স্বভাবজাত আচরণ (Instinct Behaviour)

স্বভাবজাত বা ইনস্টিক্ট আচরণ প্রাণীর এমন এক ধরনের সহজাত আচরণ যাতে কোনো প্রজাতির প্রাণী পরিবেশের নির্দিষ্ট উদ্দীপনার প্রতি সাড়া প্রদান করে প্রদর্শন করে। প্রাণীর সেসব আচরণই স্বভাবজাত যা পূর্বের কোনো অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হয়নি। প্রাণীর স্বভাবজাত আচরণ জটিল প্রকৃতির আচরণ। উপকূলীয় স্থলভাগে সদ্য প্রস্ফুটিত সমুদ্র কচ্ছপের বাচ্চা স্বভাবগতভাবেই সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, এরা স্থলভাগের দিকে ধাবিত হয় না। মার্সুপিয়ালদের (ক্যাঙারো) ছোট শাবক জন্মের সাথে সাথে মায়ের থলিতে প্রবেশ করে। মৌমাছিরা খাদ্যের উৎস জানাতে কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই মৌচাকের সামনে নৃত্য প্রদর্শন করে। এ ধরনের সকল আচরণই স্বভাবজাত বা ইনস্টিক্ট প্রকৃতির। পাখির বাসা তৈরি, যুথবদ্ধ হওয়া (courtship), যুদ্ধ করা (fighting), পলায়ন আচরণ, খাদ্য সঞ্চয় ইত্যাদি প্রাণীর স্বভাবজাত আচরণের অন্তর্গত।

প্রাণীর অনেক স্বভাবজাত আচরণ বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিকশিত হয়। যেমন, পাখির উড্ডয়নকে অনেকে শিখন আচরণ বলে থাকেন। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে কোনো পাখিকে পরিণত হওয়া পর্যন্ত পৃথক জায়গায় ডানা বেঁধে আটকে রাখার পর ছেড়ে দেয়া হলে কিছুক্ষণের মধ্যে সে উড়ে চলে যায়। এটি স্নায়ুপেশিয় পরিপক্কতার (neuromuscular maturation) কারণে ঘটে, শিখনের জন্য নয়। স্বভাবজাত আচরণ প্রাণীর একই প্রজাতির সকল সদস্যদের মধ্যে কিংবা একই লিঙ্গের সকল সদস্যের মধ্যে সমভাবে বিকশিত হয়। যেমন, নির্দিষ্ট প্রজাতির পাখি প্রজননকালে নির্দিষ্ট রকম বাসা তৈরি করে যা সে তার পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে শিখেনি। অনেক প্রজাতির প্রজাপতি জন্মের পর শীতকালে অনেক দূরে মাইগ্রেশন করে যা এরা পূর্বে কখনো করেনি। প্রাণীর অনেক আচরণ অনেকসময় স্বভাবজাত ও শিখন আচরণের সমন্বয়ে বিকশিত হয়।

প্রতিবর্ত আচরণ ও স্বভাবজাত আচরণের মধ্যে পার্থক্য: প্রাণীর প্রতিবর্ত ও স্বভাবগত আচরণ উভয়েই সহজাত আচরণ হলেও এদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রাণীর প্রতিবর্ত আচরণ সরল প্রকৃতির এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি তাৎক্ষনিক দ্রুতগতিতে সাড়া দেয়। এটি অনেকসময় প্রাণী ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা যায়। অপরদিকে প্রাণীর স্বভাবজাত আচরণ জটিল প্রকৃতির এবং ধীর গতিতে বিকশিত হয়। এটি কখনোই প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা যায় না।

সহজাত আচরণ যাচাই

১। শীতের পাখির মাইগ্রেশন (Migration of winter bird)

পাখির জীবনে এক বিশেষ ধরনের ঘটনা হলো এদের অনেক প্রজাতির ঋতুভিত্তিক পরিযান বা মাইগ্রেশন। পরিযান হলো নির্দিষ্ট সময় বা কালে এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করা। পাখির পরিযান দ্বিমুখী ধরনের। এ যাতায়ত পাখির গ্রীষ্মকালীন আবাস ও শীতকালীন আবাসের মধ্যে অথবা জনন ও বাসা নির্মাণের স্থান এবং খাদ্যগ্রহণ ও আশ্রয় স্থানের মধ্যে ঘটে।

উত্তরের বরফাবৃত এলাকা থেকে অনেক পরিযায়ী পাখি প্রতিবছর শীতকালে বাংলাদেশসহ অন্যান্য গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে আসে। এদের অতিথি পাখি বা শীতের পাখি বলা হয়। তবে এরা মোটেও অতিথি নয় বরং দুই অঞ্চলের বাসিন্দা। যে দুই অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্মকাল কাটায় সে দুই অঞ্চলই এদের বেঁচে থাকার জন্য অপিরহার্য। বাংলাদেশে যেসব পরিযায়ী পাখি দেখা যায় তাদের অধিকাংশই আসে শীতকালে। তবে অল্প কিছু পাখি আছে (যেমন-পাপিয়া, বউ কথা কও, কোকিল ইত্যাদি) যারা গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে বাসা বাঁধতে আসে । শীতে এরা আরো দক্ষিণে দক্ষিণ ভারত ও আফ্রিকার দিকে চলে যায়। আবার কিছু পাখি বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের দেশে চলে আসে।

বিশ্বে প্রায় 4000 প্রজাতির পাখি নিয়মিত অভিপ্রয়ান ঘটায় যা মোট পাখির 40%। অভিপ্রয়ানি পাখিদের মধ্যে বার- টেইলড গডউইট (*Limosa lapponica*) পাখি বিরামহীনভাবে সর্বোচ্চ দূরত্ব 7000 মাইল উড়তে পারে। বাংলাদেশে প্রায় 690 প্রজাতির পাখি পাওয়া যায় যাদের মধ্যে প্রায় 310 প্রজাতির পাখিই পরিযায়ী পাখি। এদের মধ্যে প্রায় 209 প্রজাতি শীতকালে আর 11 প্রজাতি গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে আসে। প্রায় 70 প্রজাতির পাখি অনেকসময় বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরতে ঘুরতে এদেশে চলে আসে। বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি সম্পর্কে আমাদের কিছু ভুল ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন পরিযায়ী পাখি সুদূর সাইবেরিয়া থেকে আসে। আসলে পরিযায়ী পাখির প্রায় 80% আসে হিমালয় পর্বতমালা থেকে। বাকি 20% আসে সাইবেরিয়াসহ মধ্য ও উত্তর এশিয়া থেকে। আমাদের দেশে শীতকালে সুন্দরবন, টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, চলন বিল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, মিরপুর চিড়িয়াখানা লেক এবং আরো অনেক স্থানে অসংখ্য পরিযায়ী পাখি দেখা যায়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এসব পরিযায়ী পাখির গুরুত্ব অনেক। পরিযায়ী পাখির কিছু প্রজাতি বছরের পর বছর নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ে পরিযানে অংশ নেয় এবং আগমণ ও প্রস্থান করে। এদের অনেকে বছরের পর বছর একই জনন ভূমিতে ফিরে আসে।

টাঙ্গুয়ার হাওরে শীতের পাখি

চামশঠোঁটু বাটান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শীতের পাখি

পাখির পরিযানের বিভিন্ন ঘটনা সহজাত আচরণের সাথে সম্পর্কিত। পাখির পরিযানের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হলো এদের দিক নির্ণয় বা পথ খুজে পাওয়া। এটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে নতুন পাখি তার উত্তরসূরীর নিকট থেকে পরিযানের পথ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে না। অনেকক্ষেত্রে তরুণ পাখি স্বাধীনভাবে তাদের প্রথম পরিযায়ী ভ্রমণ করে। এরা বংশগতি দ্বারা প্রাপ্ত সহজাত আচরণ দ্বারা পরিযানের পথ চিনে। এ আচরণ স্নায়ুতন্ত্রে প্রোথিত থাকে যা নির্দিষ্ট সময় প্রকাশ পায় এবং উত্তর পুরুষে গমণ করে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন যে পাখির নিজের আবাস চেনা একটি বংশগত সহজাত আচরণ। পরিযায়ী পাখির ক্ষেত্রে ঘরে বা নিজ আবাসে ফিরে আসা পিপড়া, মৌমাছি এবং বাহক কবুতরের (carrier pegion) মতো।

বাংলাদেশে আগত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিযায়ী পাখি

সাধারণ বাংলা নাম	সাধারণ ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
ছোট সারলি	Lesser Whistling Teal	*Dendrocygna javanica*
চামশঠোঁটু বাটান	Spoon billed Sandpiper	*Eurynorhynchus pygmeus*
বালিহাঁস	Cotton pygmy Goose	*Nettapus coromandelianus*
সাধারণ বাটান	Common Sandpiper	*Actitis hypoleucos*
সাপ পাখি	Darter	*Anhinga rufa*

পাখির মাইগ্রেশনের সুবিধা

পাখির পরিযায়ী আচরণ পাখির জীবনে কিছু সুবিধা এনে দেয়। যেমন-

১। তীব্র ঠাণ্ডা ও ঝড়ো আবহাওয়া থেকে পরিত্রাণে পরিযায়ী আচরণ সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে।

২। খাদ্য অন্বেষণের জন্য স্বল্প দৈর্ঘ্য দিন পরিহার করে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আলোক উজ্জ্বল দিনের সন্ধানে পাড়ি জমাতে পরিযায়ী আচরণ ভূমিকা রাখে।

৩। পরিযানের মাধ্যমে একই প্রজাতি বিভিন্ন জাতের পাখি দূরের কোনো নতুন স্থানে সমবেত হয়ে তাদের আন্তঃপ্রজনেন জিন বিনিময়ের সুযোগ ঘটে। এতে নতুন প্রকরণের উদ্ভব হয়।

৪। পরিযায়ী আচরণ পাখির জননাঙ্গের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।

৫। পরিযান অনেক পাখির খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটায়।

পাখির মাইগ্রেশনের অসুবিধা

১। বিরামহীন ও ক্লান্তিময় দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়ার সময় গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বেই অনেক পরিযায়ী তরুণ পাখি মারা পড়ে।

২। প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন-ঘূর্ণিঝড়, হারিকেন, টর্নেডো, শক্তিশালি বায়ু প্রবাহ, তুষারপাত ইত্যাদি বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী পাখির মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

৩। মানুষ নির্মিত সুউচ্চ বৈদ্যুতিক টাওয়ার, বিদ্যুৎ লাইন ও বাতিঘর পরিযায়ী পাখির চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে এবং অনেকসময় এদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪। মানুষ চিত্তবিনোদন ও অবসর কাটানোর জন্য নির্বিচারে পরিযায়ী পাখি শিকার করে।

৫। কিছু অসাধু শিকারি ও লোভী ব্যবসায়ী পরিযায়ী পাখি ধরে বাজারে বিক্রি করে।

২। মাকড়শার জাল (Spider web)

মাকড়শা Arachnida শ্রেণির সন্ধিপদী অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের একটি বিশেষ সহজাত আচরণ হলো এরা জীবনকাল ব্যাপী বিশেষ ধরনের রেশম (silk) উৎপাদন করে। এ রেশম বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়, যেমন- শিকার ধরার জন্য জাল তৈরি, বাচ্চাদের সুরক্ষা, চলনে সহায়তা এবং জনন কাজ। তবে সকল প্রজাতির মাকড়শা জাল তৈরি করে না। এদের জাল দ্বারা এরা কীট-পতঙ্গ জাতীয় শিকার ধরে খায়। মাকড়শার জাল ইস্পাতের চেয়ে শক্ত এবং নাইলনের চেয়ে দ্বিগুণ স্থিতিস্থাপক। এর রাসায়নিক উপাদান ফাইব্রোইন (fibroin) নামক স্ক্লেরোপ্রোটিন (scleroprotein)। মাকড়শার উদরের নিচের দিকে সাত জোড়া স্পিনারেট (spinnerets) নামক অঙ্গ থেকে এ প্রোটিন তরল অবস্থায় নিঃসৃত হয় এবং বায়ুর সংস্পর্শে শক্ত হয়ে যায়। এদের জালে রয়েছে এগ্লিগেট (agligate) ও ফ্লেজেলিফর্ম (flageliform) নামক আঠালো পদার্থ যাতে কীট পতঙ্গ সহজেই আটকে যায়। এছাড়া এদের জালে টিউবুলিফর্ম (tubiculiform) নামের আরো এক ধরনের পদার্থ থাকে যা দ্বারা এরা ডিমকে আটকে রাখে। প্রজাতিভেদে মাকড়শার জালের বৈচিত্র্য দেখা যায়। বিজ্ঞানী হ্যানস পিটারস (Hans Peters) 1939 সালে সর্বপ্রথম

মাকড়শার জাল বোনার কৌশল প্রতক্ষ্য করেন। একই প্রজাতিভুক্ত মাকড়শা ভিন্নরকম জাল তৈরি করে। অধিকাংশ মাকড়শা সূর্যোদয়ের সময় জাল বোনে। সাধারণত মাকড়শার পায়ে দুটি নখর থাকে, কিন্তু যেসব মাকড়শা জাল বুনে তাদের পায়ে তিনটি নখর থাকে। মাকড়শার জালের কোনো অংশ নষ্ট হয়ে গেলে উহা সেটিকে ভক্ষণ করে এবং রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ায় পুনরুৎপাদন করে।

এদের জাল চোঙাকৃতির (funnel web) বা গোলাকৃতির (orb web) বা পাতাকৃতির (sheet web) অথবা বলয়াকৃতির (dome web) হতে পরে। কিছু জাল অত্যন্ত সরল এবং মাকড়শার গর্ত বা আশ্রয়স্থল থেকে কেবলমাত্র কয়েকটি রেশমের সূতা বিচ্ছুরিত (radiate) হয়ে থাকে।

চিত্র ১২.৫ বিভিন্ন ধরনের মাকড়ার জাল

অধিকাংশ মাকড়শার জালই দৃষ্টিনন্দন জ্যামিতিক গোলক জাল। জাল তৈরিতে অনেক ধৈর্য ও সময়ের প্রয়োজন হয়। তারপরও অনেক মাকড়শা প্রতিদিন নতুন জাল তৈরি করে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে মাকড়শা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে। এদের জাল আঠালো প্রকৃতির হওয়ায় জালে ধূলিকণা, ময়লা ও আবর্জনা জমে এটি দূষিত হয়ে পড়ে। মাকড়শা এরকম পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে না। তাই তারা প্রতিদিন নতুন জাল তৈরি করে।

মাকড়শার শিকারের ধরন অনুযায়ী এদের জালের নকশা প্রণীত হয়। যেমন, যেসব মাকড়শা বৃহদাকৃতির শিকার ধরে তাদের জাল অধিক পুরু হয়। এতে শিকারের ওজনে জাল ভেঙ্গে পড়ে না। মাকড়শার জাল কয়েক সেন্টিমিটার থেকে কয়েক মিটার ব্যাসের হয়ে থাকে। মাকড়শা কখনোই তার নিজের জালে আবদ্ধ হয় না। এরা খুব সহজেই এদের জালের উপর দিয়ে দ্রুত দৌড়াতে ও হাঁটতে পারে। এদের দেহ থেকে এক ধরনের তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হয় যার কারণে এটা সম্ভব হয়। সকল মাকড়শা শিকারী প্রাণী। এদের প্রধান শিকার হলো পতঙ্গ ও অন্যান্য অমেরুদণ্ডী। অনেক বৃহদাকৃতির মাকড়শাকে পাখি পর্যন্ত শিকার করতে দেখা গেছে। প্রাণিজগতের মধ্যে Araneae বর্গের প্রকৃত মাকড়শাই সবচেয়ে বড় শিকারী গোষ্ঠী (largest group of carnivorous animals)। মাকড়শা অতি বুদ্ধিমান শিকারী প্রাণী। এরা শিকার ধরার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য একস্থানে অনেকগুলো জাল তৈরি করতে পারে। মাকড়শা বিভিন্ন উপায়ে জাল দ্বারা খাদ্য শিকার করে। কোনো শিকার বিশেষ করে পতঙ্গ মাকড়শার জালের সংস্পর্শে আসলে উহা দ্রুত পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু শীঘ্রই এর পা জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। মাকড়শা তখন শিকারের দেহে বিষ ঢুকিয়ে উহাকে অবস করে ফেলে এবং পরবর্তীতে আহার করে।

মাকড়শার জাল তৈরি একটি সহজাত আচরণ। এরা এদের পূর্বসূরীদের নিকট থেকে জাল তৈরি শেখে না। প্রাকৃতিকভাবেই এরা নিজের প্রয়োজনে জাল বুনে। প্রায় আটত্রিশ কোটি বছর যাবত মাকড়শাতে এ বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হচ্ছে।

৩। অপত্যের প্রতি যত্ন (Parental care)

প্রতিকূল পরিবেশ ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য পিতা-মাতা কর্তৃক ডিম ও অপত্য (শিশু) সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন করাকে অপত্য যত্ন বা বাৎসল্য আচরণ (parental care) বলে। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য প্রাণীর মধ্যে এ আচরণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত ও অভিযোজিত হয়েছে। অপত্য যত্ন মাতৃতান্ত্রিক (maternal), পিতৃতান্ত্রিক (paternal), পিতৃ-মাতৃতান্ত্রিক (biparental) বা অন্য প্রজাতির প্রাণী (alloparenting) দ্বারা হতে পারে। স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এ আচরণ উন্নত হলেও সামাজিক পতঙ্গ, মাছ, উভচর, সরীসৃপ ও পাখিতে বিভিন্নভাবে এ আচরণ প্রদর্শিত হয়। ডিম কিংবা সন্তান সংখ্যা কম উৎপাদিত হলে প্রাণীর অপত্য যত্ন দেখা যায়। অপত্য লালন প্রাণীর এক ধরনের পরার্থপর আচরণ যাতে সন্তানরা তাদের পিতামাতার নিকট থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা অর্জন ও বৃদ্ধি করে। অপত্য লালন আচরণ প্রাণীতে তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যথা-

(১) বাসা তৈরি, (২) ডিমে তা দেয়া এবং (৩) বাচ্চার প্রতি যত্ন নেয়া।

মাছের অপত্য যত্ন: অধিকাংশ মাছ তাদের ডিম ও পোনার কোনো যত্ন নেয় না। এ কারণে এরা অধিক পরিমাণে ডিম পাড়ে যাতে প্রজাতি রক্ষায় কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। কিন্তু অনেক প্রজাতির মাছ কম সংখ্যক ডিম ও পোনা উৎপাদন করে। ফলে এদের অপত্য লালন আচরণ প্রদর্শিত হয়। মাছ নানাভাবে ডিম ও পোনার পরিচর্যা ও প্রতিপালন করে থাকে। টেলিওস্ট মাছদের 21% প্রজাতিতে অপত্য যত্ন দেখা যায় যাদের 61% ই করে থাকে পুরুষ সদস্য।

নিকো টিনবারজেন (Niko Tinbergen, 1953) তিন কাঁটা স্টিকলব্যাক (Three spined Stickleback- *Gasterosteus aculeatus*) মাছে চমকপ্রদ অপত্য লালনের তথ্য প্রদান করেন। এসব মাছ উত্তর গোলার্ধের উপকূলীয় এলাকায় পাওয়া যায়। এদের পুরুষ মাছ ডিম পাড়ার জন্য প্রজনন এলাকা নির্ধারণ করে এবং অগভীর পানিতে বাসা নির্মাণ করে। এরা 'জিগ-জ্যাগ নৃত্য' (zig-zag dance) প্রদর্শনের মাধ্যমে যৌন পরিপক্ক স্ত্রী মাছকে বাসায় নিয়ে আসে। পুরুষের প্ররোচনায় স্ত্রীটি বাসায় ডিম পাড়ে। ডিমগুলোর উপর পুরুষ মাছটি শুক্রাণু ত্যাগ করে নিষেক ঘটায়। নিষেকের পর পুরুষটি স্ত্রীকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং আরো দু-তিনটি স্ত্রীকে একইভাবে বাসায় এনে ডিম পাড়ায়।

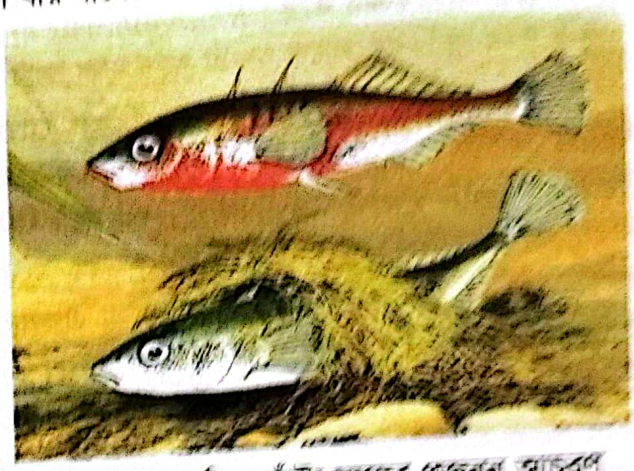

চিত্র ১২.৬ তিন কাঁটা মাছের প্রজনন আচরণ

ডিম ও বাচ্চাদের যত্ন নেয়ার সকল দায়িত্ব পুরুষটি গ্রহণ করে। এরা নিষিক্ত ডিমগুলোকে বাসার নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখে। এসময় স্বজাতীয় স্ত্রী, পুরুষ, অন্য মাছ কিংবা খাদক ইত্যাদি যে কোনো ধরনের আগন্তুককে বাসার নিকট ভিড়তে দেয় না। এসময় এরা বক্ষ পাখনা দ্বারা বাসার মধ্যে পানির স্রোত সৃষ্টি করে যাতে ডিমগুলো পরিস্ফুটনের জন্য পরিমিত অক্সিজেন পায়। এ পদ্ধতিকে ফ্যানিং (fanning) বলে। ডিম ফুটতে 7-8 দিন সময় লাগে। পোনাগুলো ঝাঁক বেঁধে চলা শিখতে না পারা পর্যন্ত এরা বাসা পাহাড়া দেয়। কখনো কোনো পোনা দলছুট হলে পুরুষটি ছুটে গিয়ে পোনাকে মুখে পুরে এনে নিজ দলের মধ্যে ছেড়ে দেয়। প্রায় 15 দিনের মধ্যে পোনাগুলো ঝাঁক বেঁধে চলার স্বভাব রপ্ত করে ফেললে পুরুষটি বাসা ত্যাগ করে পূর্ণবয়স্ক সাথীদের সাথে চলে যায়।

ব্যাঙের অপত্য যত্ন: জলজ জীবন থেকে স্থলজ জীবনে প্রবেশ করায় ব্যাঙ তথা উভচর প্রাণীরা নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়। এসব সমস্যা, বিশেষ করে প্রজনন ও বংশরক্ষার জন্য ব্যাঙের বিভিন্ন প্রজাতি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ডিম ও সন্তানের প্রতি যত্ন নেয়। প্রায় 71% ব্যাঙে অপত্য যত্ন দেখা যায় যেখানে পুরুষ ও স্ত্রী সমানভাবে অংশগ্রহণ করে।

কতক প্রজাতির ব্যাঙ স্থান নির্বাচনের মাধ্যমে ডিমের প্রতি যত্ন নেয়। জাপানী গেছো ব্যাঙ *Rhacophorus schlegeli* নদী বা পুকুরের কর্দমাক্ত কিনারায় গর্ত খনন করে। স্ত্রী ব্যাঙ তার ক্লোয়েকা নিঃসৃত রস দিয়ে তৈরি ফেনার মধ্যে ডিম পাড়ে এবং পুরুষ ব্যাঙ ডিমের উপর শুক্র ত্যাগ করে নিষেক ঘটায়।

চিত্র ১২.৭ ব্যাঙের বিভিন্ন ধরনের অপত্য যত্ন

অনেক প্রজাতির ব্যাঙ ডিম পাড়ার পূর্বে বাসা তৈরি করে ডিম ও বাচ্চাদের প্রতিপালন করে। *Hyla faber* নামক ব্যাঙ জলাশয়ের কিনারায় কাদা দিয়ে গোলাকার বাসা তৈরি করে। এ বাসাতে ডিম ও বাচ্চাগুলো নিরাপদে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার গেছো ব্যাঙ *Phyllomedusa hypochondrales* জলাশয়ের উপরে উদ্ভিদের ঝুলন্ত শাখায় পাতা দিয়ে বাসা তৈরি করে। *Hyla resinfictrix* নামক গেছো ব্যাঙ মৌমাছির বাসা হতে মোম সংগ্রহ করে গাছের কাণ্ডে বাটির মতো বাসা তৈরি করে। *Rhacophorus maculatus* পানিতে ডিম পাড়ার পর পরই স্ত্রী ও পুরুষ মিলে ফেনার সৃষ্টি করে যা ডিমগুলোকে শুষ্কতা হতে রক্ষা করে। অনেক প্রজাতির ব্যাঙ মুখে ও পিঠে ডিম বা লার্ভা বহন করে।

পাখির অপত্য যত্ন: কাউবার্ড ও কোকিল ব্যতিত সকল পাখিতে অপত্য যত্ন দেখা যায়। এসময় এদের বিভিন্ন ধরনের আচরণ পরিলক্ষিত হয়। নিকো টিনবারজেন (Noko Tinbergen, 1953) সমুদ্র চিলের (Sea gull or herring gull- *Larus argentatus*) অপত্য লালন নিয়ে চিত্তাকর্ষক তথ্য প্রকাশ করেন। এরা সাধারণত মোহনা কিংবা সাগরের উপকূলে বালিময় স্থানে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। প্রজননের সময় এরা জোড় বাঁধে এবং দুজনে মিলে বাসা তৈরী করে। এদের অনেকগুলো বাসা একসাথে তৈরী হয় বলে কলোনি গঠিত হয়। বাসাতে স্ত্রী পাখিটি ডিম পাড়ার পর পালাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রী ডিমে তা দেয়। এরা কখনো ডিম ফেলে একসাথে কোথাও যায় না।

ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর এদের প্রকৃত অপত্য লালন শুরু হয়। এদের বাচ্চাগুলো প্রস্ফুটনের কিছুক্ষণ পরই খাদ্য প্রাপ্তির জন্য পিতা-মাতার প্রতি আবেদন জানাতে থাকে। পিতা-মাতা খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ করে দিলে বাচ্চারা পিতা-মাতার শেখানো চঞ্চু উঁচু করে ঠুকরিয়ে খাওয়ার কৌশল রপ্ত করে ফেলে। কলোনিতে কোনো শত্রু বা আগন্তুকের অনুপ্রবেশ ঘটলে বাচ্চা ও পিতা-মাতার মধ্যে ভিন্নধর্মী এক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এসময় কলোনির বয়স্ক পাখিরা তাদের সুপরিচিত স্বভাবসিদ্ধ সংকেত ধ্বনি গা -গা -গা! গা -গা -গা -গা -গা শব্দ উচ্চারণ করে উড়ে যায়। এতে বাচ্চারা দৌড়ায়ে কোনো নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে পরে। এছাড়া প্রতিটি যুগল আগন্তুকের উপর স্বতন্ত্রভাবে আক্রমণ চালায়। অনেকসময় এরা আগন্তুকের উপর বমি ও মল ত্যাগ করে কিংবা পায়ের নখর দিয়ে আঘাত করে। ক্রমে বাচ্চারা স্বাধীন হতে শিখলে পিতা-মাতা এদের ত্যাগ করে পূর্বের দলে ভিড়ে যায়।

মাছ, ব্যাঙ ও পাখির অপত্য যত্ন সম্পুর্ণরূপে হরমোন নিয়ন্ত্রিত সহজাত আচরণ। এটি ডিম উৎপাদন থেকে শুরু হয় এবং বাচ্চা স্বনির্ভর না হওয়া পর্যন্ত চলে।

চিত্র ১২.৮ পাখির অপত্য লালন

১২.৪ শিখন আচরণ (Learning behaviour)

প্রাণীর জন্মগত বা সহজাত আচরণগুলো সবক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে উঠতে পারে না। প্রকৃতির বিচিত্র পরিমণ্ডলে টিকে থাকার জন্য প্রাণীকে অনেক কিছু নতুনভাবে আয়ত্ত করতে হয়। জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রাণীর অতীত অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে নতুন বিষয় আয়ত্ত করাকে শিখন বলে। প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাণীর যে আচরণ অর্জিত হয় তাকে শিখন বা শিক্ষালব্দ আচরণ বলে। ম্যাকগোচ (McGoach) এর মতে "শিখন হলো অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন।" সি. টি মর্গান (C.T. Morgan) ও আর এ কিং (R.A. King) এর মতে "অতীত অভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের ফলে আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তনকে শিখন বলে।"

শিখন আচরণের বৈশিষ্ট্য

(১) এটি প্রজাতি সুনির্দিষ্ট কিংবা স্বভাবজাত নয়।
(২) এটি জটিল প্রকৃতির এবং শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়।
(৩) এ আচরণ সর্বদা পরিবর্তনশীল।
(৪) এ আচরণ প্রদর্শনের জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়।
(৫) শিখন সর্বদা অভিযোজনীয়; এটি সাধারণত উচ্চশ্রেণির প্রাণীতে দেখা যায়।
(৬) শিখন আচরণ বংশ পরম্পরায় প্রদর্শিত হতে থাকে না।

শিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রাণীতে বিভিন্ন ধাপে এ বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়। প্রেষণা (motivation), অনুসঙ্গ (association), বলবৃদ্ধি (reinforcement), পর্যবেক্ষণ (observation), মনোযোগ (attention), পুনঃপ্রচেষ্টা (repeated trial), সান্নিধ্য (contiguity) ইত্যাদি ধাপ অতিক্রম করে প্রাণীতে শিক্ষণ আচরণ অর্জিত হয়। Thrope শিখন আচরণকে নিম্নলিখিত ছয় ভাগে ভাগ করেছেন:

১। অভ্যাসগত শিখন (Habituation learning): প্রাণীর শিক্ষাদানের সবচেয়ে সহজ রূপ হলো অভ্যাসগত আচরণ। কোনো প্রাণী পুনঃপুনঃ উদ্দীপনার ফলশ্রুতিতে বার বার সাড়া প্রদান করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর এর স্বাভাবিক আচরণ কমে যেতে থাকে এবং অবশেষে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে প্রাণী সেই পরিবেশে অভ্যস্থ হয়ে যায়। এ ধরনের শিখন আচরণকে অভ্যাসগত আচরণ বলে। যেমন- কোনো মাকড়শাকে জাল বুননের সময় যদি লাঠি দিয়ে নাড়া দিয়ে দেয়া হয় তাহলে দেখা যাবে মাকড়শাটি অন্যত্র সরে গিয়ে আবার জাল বুনছে। কিন্তু এভাবে বার বার নাড়া প্রদান করলে দেখা যাবে সে আর সরে যাচ্ছে না অর্থাৎ বাধা পাওয়ার প্রবণতা সহনশীল হয়ে গেছে। অভ্যাসগত আচরণের ফলে কারখানাতে শ্রমিকরা শব্দময় পরিবেশে কাজ করতে পারে।

২। সাপেক্ষণ শিখন (Conditioning learning): কোনো উদ্দীপকের প্রতি শর্তাধীন সাড়া দিয়ে যে শিখন আচরণ অর্জিত হয় তাকে সাপেক্ষণ শিখন বলে। যেমন-হাঁসমুরগিকে খাবার দেয়ার সময় নির্দিষ্ট শব্দ করলে এবং পরবর্তীতে খাবার না দিয়েও ঐ শব্দ করলে এরা সাড়া প্রদান করে।

৩। পরীক্ষালব্দ শিখন (Trial and error learning): ভুল সংশোধনের মাধ্যমে কিংবা তিক্ত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে প্রাণী যে শিক্ষালাভ করে তাকে পরীক্ষালব্ধ শিখন বলে। যেমন, একটি ব্যাঙ একটি বিষাক্ত মিলিপোডকে সর্ব প্রথম দেখামাত্র উহাকে মুখে নিয়ে নেয়। কিন্তু মিলিপোড উহার দেহ হতে বিষ নিঃসরণ করলে ব্যাঙ বুঝতে পারে যে উহা তার খাদ্য নয়। পরবর্তীতে মিলিপোড দেখলে ব্যাঙ উহাকে আর শিকার করে না।

৪। প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত শিখন (Latent learning): যখন কোনো বৈশিষ্ট্য সুপ্তাবস্থায় থাকে কিন্তু পারিপার্শ্বিক কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রকাশিত হয় তখন তাকে সুপ্ত শিখন বলে। যেমন, পাখির ডিম পাড়ার প্রবণতা সুপ্তাবস্থায় থাকে কিন্তু ডিম পাড়ার ক্রান্তি লগ্নে তা জাগ্রত হয়।

৫। অনুকরণ শিখন (Imprinting learning): বিশেষ ধরনের সীমিত শিখন আচরণ হলো অনুকরণ। সচরাচর প্রাণীর জীবনের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিছু অভিজ্ঞতার আলোকে তার আচরণে যে সব হঠাৎ স্থায়ী পরিবর্তন হয় তাহাই হলো অনুকরণ।

অস্ট্রিয়ান ইথোলজিস্ট কনরেড লরেঞ্জ (Konrad Lorenz, 1937) একে এক অভিনব শিখন আচরণ হিসেবে অভিহিত করেন। তরুণ প্রাণীর বর্ধনের অতি সংবেদনশীল মূহুর্তে এ ধরনের শিখন প্রত্যক্ষ করা যায়। পাখির ক্ষেত্রে ডিম ফুটে ছানা বের হওয়ার পর পরই এ শিখন লক্ষ করা যায়। হাঁস-মুরগিসহ যে সব পাখির ছানাগুলো ডিম থেকে বের হওয়ার পর পরই হাঁটতে পারে তাদের মধ্যে অনুকরণ শিখন দেখা যায়। লরেঞ্জ লক্ষ করেন যে তার পালিত হাঁসের ডিম থেকে বাচ্চা গুলো বের হয়ে প্রথমে তাকে দেখে এবং অনুকরণ করতে থাকে। এগুলো তাঁকে সর্বদা অনুসরণ করে এবং পরিণত বয়সেও এরা তাঁর নিকট থাকতে পছন্দ করে।

চিত্র ১২.৯ লরেঞ্জের পালিত হাঁস

৬। অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন (Insight learning): পরিস্থিতি দেখে হঠাৎ করে কোনো সমাধান খুঁজে নেয়াই হলো অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন। জার্মান মনোবিজ্ঞানী Wolfgang Kohler (1920) শিম্পাঞ্জির অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন আচরণ পরীক্ষণ করেন। শিম্পাঞ্জির খাঁচায় কতগুলো বাক্স রেখে নাগালের বাইরের উচ্চতায় কলা টানিয়ে রাখা হলে শিম্পাঞ্জি তার নিজ বুদ্ধি খাটিয়ে বাক্সের উপর বাক্স সাজায়ে সে স্তুপের উপর দাড়িয়ে কলা পেরে খায়।

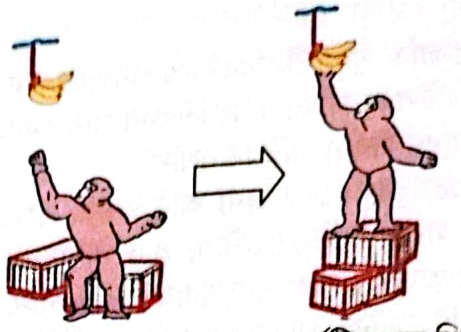

চিত্র ১২.১০ শিম্পাঞ্জির অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন

শিক্ষালব্ধ আচরণ ও সহজাত আচরণের মধ্যে পার্থক্য

শিক্ষালব্ধ আচরণ	সহজাত আচরণ
১। শিক্ষণ, প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাণীর যে আচরণ অর্জিত হয় তাকে শিক্ষালব্দ আচরণ বলে।	১। প্রাণীতে অনেকগুলো প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় সৃষ্ট সরল, পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবর্জিত, শিক্ষাবিহীন ও বংশগত আচরণকে সহজাত আচরণ বলে।
২। এটি প্রজাতি সুনির্দিষ্ট নয়।	২। এটি প্রজাতি সুনির্দিষ্ট।
৩। এটি স্বভাবজাত নয়।	৩। এটি স্বভাবজাত।
৪। এটি জটিল প্রকৃতির এবং শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়।	৪। এটি সরল প্রকৃতির এবং বংশগতির ধারা অনুযায়ী জন্মগতভাবে অর্জিত হয়।
৫। এ আচরণ সর্বদা পরিবর্তনশীল।	৫। এ আচরণ পরিবর্তনশীল নয়।
৬। এ আচরণ প্রদর্শনের জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়।	৬। অভিজ্ঞতা ছাড়াই এ আচরণ প্রদর্শিত হয়।
৭। এটি সর্বদা অভিযোজনীয়।	৭। এটি সচরাচর অভিযোজনীয়।
৮। এটি সাধারণত উচ্চশ্রেণির প্রাণীতে দেখা যায়।	৮। এটি উচ্চ ও নিম্ন উভয় শ্রেণির প্রাণীতে দেখা যায়।
৯। এ আচরণ বংশ পরম্পরায় প্রদর্শিত হতে থাকে না।	৯। এ আচরণ বংশ পরম্পরায় প্রদর্শিত হতে থাকে।

১২.৫ প্যাভলভ-এর পরীক্ষা: কুকুরের লালার প্রতিবর্ত ক্রিয়া

কোনো উদ্দীপকের প্রতি শর্তাধীন সাড়া দিয়ে যে শিখন আচরণ অর্জিত হয় তাকে সাপেক্ষণ শিখন আচরণ বলে। এটি একটি অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষা। কোনো সহজাত আচরণকে অভ্যাস দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিবর্তন করা যায়। রাশিয়ান শারীরতত্ত্ববিদ **ইভান প্যাভলভ** (Ivan Pavlov) এর কুকুর ও লালা নিঃসরণের পরীক্ষণ সাপেক্ষণ শিখন আচরণের এক বিস্ময়কর ঘটনা।

কুকুরের মুখে মাংসের টুকরা দিলে মুখ গহ্বরে লালা নিঃসৃত হয়। এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু বিজ্ঞানী প্যাভলভ ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখে মাংসের টুকরা দেয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে একটা ঘণ্টা বাজান। তিনি এভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে সাথে সাথে এক টুকরা মাংস কুকুরকে দিতে থাকেন। এতে প্রতিবারই কুকুরের মুখে লালা নিঃসৃত হতে থাকে। তিনি প্রতিবারই যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে লালা নিঃসরণের মাত্রা পরিমাপ করেন।

কাজটি বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তির পর হঠাৎ করে মাংসের টুকরা না দিয়ে তিনি কেবল ঘণ্টা বাজান। এ পর্যায়ে দেখা গেলো কেবল ঘণ্টাধ্বনির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কুকুরটি লালা নিঃসরণ করলো। এরপর মাংসের টুকরা না দিয়ে প্যাভলভ যতবার শুধু ঘণ্টা বাজালেন ততবার সাথে সাথে কুকুরের মুখ থেকে লালা নিঃসৃত হলো। অর্থাৎ ঘণ্টাধ্বনির সাথে কুকুরের লালা নিঃসরণের একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ঘণ্টাধ্বনি এবং মাংসের টুকরার যুগপৎ উপস্থাপনের ফলে

এদের মধ্যে এক সংযোগ গড়ে উঠেছে। এ সংযোগ ব্যবস্থা কুকুরের মস্তিষ্কে স্নায়বিক সংযোগের মাধ্যমে কার্যরত। প্যাভলভ এরূপ মস্তিষ্কজাত সংযোগ ক্রিয়াকে চিরায়ত সাপেক্ষণ (classical conditioning) নামে আখ্যায়িত করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঘণ্টাধ্বনি প্রথমে একটি নিরপেক্ষ উদ্দীপক ছিলো। কিন্তু ঘণ্টাধ্বনির সাথে মাংসের টুকরা কয়েকবার উপস্থাপনের ফলে কুকুরটি ঘণ্টাধ্বনির প্রতি লালা নিঃসরণ করতে শিখলো। প্যাভলভ এ ঘণ্টাধ্বনিকে সাপেক্ষ উদ্দীপক (conditioned stimulus) এবং ঘণ্টাধ্বনির প্রতি সাড়া দিয়ে লালা নিঃসরণের ঘটনাকে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (conditioned response) বলে অভিহিত করেছেন।

চিত্র ১২.১১ প্যাভলভ এর পরীক্ষা: কুকুরের লালা নিঃসরণ

১২.৬ সামাজিক আচরণ (Social behaviour)

একই প্রজাতিভুক্ত কিছু সংখ্যক প্রাণী বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন কারণে বিশেষ শৃঙ্খলার সাথে একত্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ব্যবস্থাকে **সমাজবদ্ধতা** বলে। প্রাণিজগতের মধ্যে মৌমাছি, পিপড়া, বোলতা, উইপোকা, মাছ, পাখি ও প্রাইমেট স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে সমাজবদ্ধতা দেখা যায়। এ ধরনের আচরণে একই প্রজাতিভুক্ত প্রাণীর বিভিন্ন সদস্য একে অপরের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত এবং প্রত্যেকে পরস্পরের সহযোগী। প্রজননকালে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠা সরল ও সংক্ষিপ্ত আন্তঃক্রিয়া থেকে স্থায়ী জটিল সমাজবদ্ধ জীবনযাপন প্রণালী পর্যন্ত সামাজিক আচরণের পরিসর বিস্তৃত।

সামাজিক প্রাণীর বৈশিষ্ট্য

১। সামাজিক প্রাণিগোষ্ঠীতে একই প্রজাতির অনেক সদস্য সক্রিয়ভাবে একত্রিত হয় এবং পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করে।

২। সামাজিক গোষ্ঠীর সংগঠনে ও আচরণে শ্রমবিভাজন অতি স্পষ্ট।

৩। অনেক প্রজাতির সামাজিক গোষ্ঠীতে জনুর অধিক্রমণ ঘটে।

৪। সামাজিক গোষ্ঠীতে সামাজিক আচরণ বিভিন্ন স্তরে প্রকাশিত হয়।

অ্যালট্রুইজম (Altruism): পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা বা পরার্থপরতা

প্রাণিজগতের অধিকাংশ প্রাণীই কিছুটা স্বার্থপর। কেননা প্রতিটি প্রাণীই চায় তার নিজ প্রজননিক সফলতা সর্বোচ্চ মাত্রায় বিরাজ করুক। আর এ লক্ষ অর্জনের জন্য অপরের স্বার্থ বিবেচনায় না এনে নিজের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য আচরণ করে। প্রজননিক সফলতা বজায় রাখতে হলে প্রাণীকে বহুলাংশে আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর হতে হয়। কিন্তু কতক প্রজাতির প্রাণী সামাজিক আচরণের এক পর্যায়ে স্বজাতীয় অন্যান্য সদস্যদের কল্যাণার্থে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে থাকে। একই প্রজাতির অন্য সদস্যদের প্রতি প্রাণীর এরূপ আচরণকে অ্যালট্রুইজম বা পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা বলে। ফরাসি দার্শনিক অগাস্ট কমটি (August Comte) 1851 সালে সর্ব প্রথম Altruism শব্দটি প্রণয়ন করেন। রক্তের সাথে সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়দের (kin) ঘিরে এ আচরণ বিকশিত হলেও ভিন্ন দুটি গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেও এরূপ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

অ্যালট্রুইজম এর উদাহরণ

প্রাণিজগতের অনেক প্রজাতিতে অ্যালট্রুইজম দেখা যায়। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো:

১। গ্রাউন্ড স্কুইরেল (*Marmota* sp.) মাটিতে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। শিকারী বাজ পাখি দেখা মাত্র এদের যে কোনো একটি সদস্য সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং কর্কশ সতর্ক সংকেত সৃষ্টি করে। এতে দলের অন্যান্য সদস্যরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায় কিন্তু অনেকসময় সে নিজেই বাজ পাখির শিকারে পরিণত হয়।

২। আফ্রিকাতে বেজী সদৃশ্য দলবদ্ধ প্রাণী মিরক্যাট (Meerkat-*Suricata suricatta*) এর কোনো কোনো সদস্য বাচ্চাদের দেখাশুনা করার জন্য খাদ্যসংগ্রহে বের না হয়ে বাসায় থেকে যায়। ফলে দলের অন্যান্য সদস্যরা নিশ্চিন্তে খাবারের জন্য বাইরে যেতে পারে।

৩। হায়েনা এবং বন্য কুকুর শিকার শেষে দলের যেসব সদস্য শিকারে অংশগ্রহণ করে না তাদের জন্য খাবার নিয়ে আসে।

৪। রক্তচোষা বাদুর (Vampire bats) দলের যেসব সদস্য রাতে খাবার খেতে ব্যর্থ হয় তাদের জন্য খাবার গ্রহণকারী সদস্যরা রক্ত উদগীরণ করে খাওয়ায়।

৫। আফ্রিকার ভারবেট বানর (Vervet monkeys- *Chlorocebus pygerythrus*) শিকারীর উপস্থিতি টের পেলে অন্যান্য সদস্যের জন্য একটি সতর্ক সংকেত প্রদান করে, এমনকি শিকারীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে যাতে অন্যান্য সদস্যরা নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে।

৬। অনেক প্রজাতির মাকড়শা যেমন, জাপানি ফোলিয়েজ মাকড়শার (Japanese foliage spider-*Chiracanthium japonicum*) মা তার বাচ্চাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করে। এরা এদের বৃহদাকৃতির ডিমের পিণ্ডটি বুক দিয়ে আলগে রাখে। ডিম ফুটে শত শত বাচ্চা বের হয়ে মায়ের দেহকে খেতে শুরু করে এবং একসময় নিঃশেষ করে ফেলে।

৭। পিপড়া, বোলতা, মৌমাছি এবং উইপোকার মতো সামাজিক পতঙ্গের কলোনিতে বন্ধ্যা প্রকৃতির স্ত্রী কর্মীগুলো রাণীর সেবা, বাসা নির্মাণ, বাসা পাহাড়া, খাদ্য অন্বেষণ ও সংগ্রহ এবং অপত্যদের লালনের মাধ্যমে তাদের জীবন উৎসর্গ করে।

৮। মা বেবুন তার সন্তানদের প্রতি যত্ন নেয়া ও তাদের রক্ষার জন্য প্রায় ছয় বছর কাটিয়ে দেয়।

মৌমাছির সামাজিক আচরণে অ্যালট্রুইজম বা পরার্থপরতা

Honey bee বা মৌমাছি Arthropoda পর্বের Insecta শ্রেণির Hymenoptera বর্গের *Apis* গণভুক্ত প্রাণী। এদের বিস্তৃতি বিশ্বব্যাপি। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রজাতির মৌমাছি পাওয়া যায়। বাংলাদেশে তিন প্রজাতির মৌমাছি পাওয়া যায়, যথা- *Apis indica, Apis dorsata* ও *Apis florea*। ইউরোপ ও আফ্রিকায় প্রাপ্ত মৌমাছির প্রজাতি হলো যথাক্রমে *Apis melllifera* ও *Apis adamsoni.*

মৌমাছি সামাজিক প্রাণী। এরা চরমভাবে পরার্থপর। এদের সমাজের প্রতিটির সদস্য সমাজের জন্য নিবেদিত প্রাণ। এরা নিজের স্বার্থে কোনো কাজ করে না। মৌমাছিরা সামাজিক রীতিনীতি কঠোরভাবে মেনে চলে। মৌমাছির 50,000 থেকে 100,000 সদস্য একত্রে কলোনি গঠন করে বাস করে। এদের বাসাকে মৌচাক (honey comb) বলে। *Apis indica* গাছের ফোকর, গাছের ডাল, ঘন ঝোপ-ঝাড়, উঁচু ঢিবির মাটির গর্তে, দালান বা ঘরের সুবিধাজনক স্থানে বাসা তৈরি করে। এদেরকে গৃহেও পালন করা যায়। *Apis dorsata* গাছের উঁচু ডালে বা ফোকরে, দালানের কার্নিশে বাসা তৈরি করে। তবে এরা বছরে একবার মাইগ্রেশন করে পাহাড়ি এলাকায় চলে যায়। *Apis florea* গাছের ডালে কিংবা ঘরের কার্নিশে ক্ষুদ্র বাসা তৈরি করে।

মৌমাছির জাত (Castes of honeybee)

মৌমাছিদের জাত বা কাস্ট (cast) দেখা যায়। মৌমাছির কলোনিতে তিন জাতের মৌমাছি থাকে। এরা হলো- একটি রাণী (queen), কয়েক হাজার কর্মী (worker) ও কয়েকশত পুরুষ (drone)। মৌমাছিদের শ্রমবণ্টন লক্ষ্য করা যায়। তিন ধরনের মৌমাছির দৈহিক গঠনে ভিন্নতা দেখা যায়। এদের এরূপ অবস্থাকে বহুরূপতা (polymorphism) বলে।

রানী মৌমাছি (Queen bee)

গঠন: একটি মৌচাকে মাত্র একটি রানী মৌমাছি থাকে। রানী মৌমাছি আকারে অনেক বড়। এদের উদর বেশ প্রশস্ত। এদের ডানাগুলো ছোট এবং উদরের শেষ প্রান্ত ক্রমশ সরু। এ সরু প্রান্তে বাঁকানো হুল থাকে যা রূপান্তরিত ওভিপজিটর (ovipositor)। এদের প্রোবোসিস ও রেণুথলি থাকে না, পদ ক্ষুদ্রাকৃতির, ম্যান্ডিবল বা চোয়াল তীক্ষ্ম, মোম ও মধু সৃষ্টি করতে পারে না, লালাগ্রন্থি নেই।

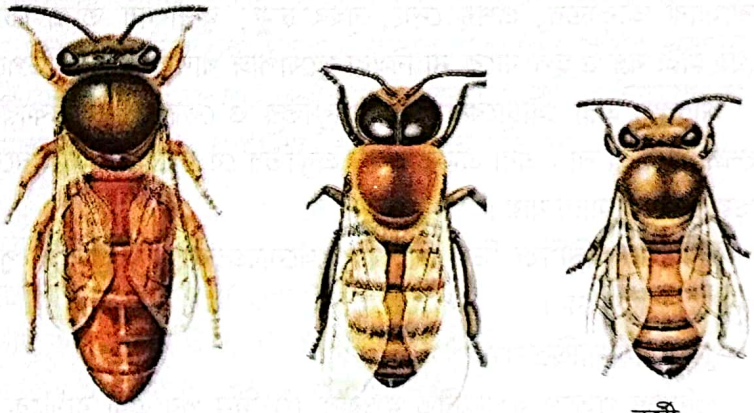

চিত্র ১২.১২ মৌমাছির বিভিন্ন জাত

আচরণ: রাণী মৌমাছি অধিকাংশ সময় মৌচাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কেবল সঙ্গম উড্ডয়ন বা নপসিয়াল উড্ডয়নের (nauptial flight) সময় মৌচাক থেকে বের হয়ে আসে। এরা জীবনে একবার কয়েকশত পুরুষের সাথে সঙ্গমে অংশগ্রহণ করে অসংখ্য শুক্রাণু গ্রহণ করে যা সারা জীবন ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে। রানী সঙ্গম উড্ডয়নে ব্যর্থ হলে নতুন কলোনি সৃষ্টি হয়না বা পূর্বের কলোনি নষ্ট হয়। সঙ্গমের পর রাণী মৌমাছি প্রতিদিন প্রায় 1500-2000 ডিম পাড়ে। সকল ডিম নিষিক্ত হয় না। নিষিক্ত ডিম থেকে স্ত্রী (কর্মী ও রানী) এবং অনিষিক্ত ডিম থেকে পুরুষ মৌমাছি সৃষ্টি হয়। রানী মৌমাছি 3-5 বছর বাঁচে।

রাণীর উৎপত্তি: রানী মরে গেলে কিংবা প্রজননে অক্ষম হলে কর্মীরা বিকাশরত লার্ভাকে বিশেষভাবে তৈরি রাজকীয় জেলি (royal jelly) খাওয়ায়ে কলোনিতে 16 দিনের মধ্যে নতুন রানী সৃষ্টি করে। এ ঘটনাকে সুপার সিডিওর (super sedure) বলে। নতুন রানী বের হয়ে মৌচাকে বিকাশরত অন্যান্য রানীদের হুল ফুটিয়ে হত্যা করে। একই সময়ে দুটি নতুন রানী বের হলে এরা মরণ যুদ্ধে (duel to the death) লিপ্ত হয়। যুদ্ধে জয়ী রানী কলোনির সার্বিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

রাজকীয় জেলি: এটি কর্মী মৌমাছির হাইপোফ্যারিনজিয়াল ও ম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত ভিটামিন, প্রোটিন ও স্টেরয়েড সমৃদ্ধ এক ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য যা রাণী মৌমাছিকে লার্ভা দশায় ও পূর্ণাঙ্গ দশায় খাওয়ানো হয়। এর রাসায়নিক উপাদান হলো: পানি-66.05%, প্রোটিন-12.34%, চিনি-12.43%, লিপিড-5.46% অজৈব বস্তু-0.92% এবং ভিটামিন ও অন্যান্য বস্তু-2.80%। বর্তমানে রাজকীয় জেলি ত্বক চর্যার দামী প্রসাধন হিসেবে বাজারে বিক্রি হয় যা ত্বকের ভাঁজ ও বয়সের ছাপ কমাতে সাহায্য করে।

রাণীর মৌমাছির কাজ

১। রাণী মৌমাছি কলোনিতে একমাত্র প্রজননক্ষম স্ত্রী মৌমাছি।
২। এরা ডিম পাড়ে এবং কলোনির প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে।
৩। জীবদ্দশায় একটি রাণী মৌমাছি প্রায় দেড় লক্ষ ডিম পাড়ে।
৪। রানী মৌমাছি কলোনির স্বার্থে কঠোরভাবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে।
৫। এরা কখনোই কলোনি ত্যাগ করে না।
৬। এরা অবিরাম বাচ্চা উৎপাদন করে কলোনির আকৃতি সমৃদ্ধ করে।
৭। রাণী মৌমাছির মস্তক থেকে ক্ষরিত তরল ফেরোমন (Pheromone=Oxydecenoic acid) মৌচাকের বিভিন্ন সদস্যদের সংঘবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে।

পুরুষ মৌমাছি (Drones)

গঠন: ড্রোন কলোনির প্রজননক্ষম পুরুষ মৌমাছি। কলোনিতে 300-3000 পর্যন্ত ড্রোন থাকে। এরা কর্মী ও রানীর মাঝামাঝি আকৃতির, প্রশস্থ দেহ, বৃহৎ চক্ষু, ক্ষুদ্রাকার তীক্ষ্ণ চোয়াল বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এদের মোমগ্রন্থি, মধু সংগ্রহকারী যন্ত্র ও হুল থাকে না কিংবা মুখোপাঙ্গ খাদ্য সংগ্রহের উপযোগী নয়।

আচরণ: এরা মৌচাকের অলস প্রকৃতির ও কোলাহল সৃষ্টিকারী সদস্য। এরা প্রতিরক্ষা বা খাদ্য সংগ্রহের কাজে অংশগ্রহণ করে না। এরা এমন অলস প্রকৃতির যে নিজের খাদ্য নিজে গ্রহণ করে না। কোনো কারণে কর্মী মৌমাছি না খাওয়ালে এরা মারা যায়।

উৎপত্তি: অনিষিক্ত ডিম থেকে পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় পুরুষ মৌমাছি সৃষ্টি হয়। তাই এরা হ্যাপ্লয়েড (n) প্রকৃতির হয়ে থাকে।

পুরুষ মৌমাছির কাজ

পরিণত পতঙ্গে রূপান্তরিত হওয়ার 10 দিন পর এরা রাণীকে নিষিক্ত করতে সক্ষম হয়। প্রায় 500 পুরুষ সঙ্গম উড্ডয়নে অংশ গ্রহণ করে। সঙ্গমই পুরুষ মৌমাছির একমাত্র কাজ। এরা জীবনে কেবল একবার রানী মৌমাছির সহিত যৌন মিলনের আকাঙ্খায় অপেক্ষা করে এবং মিলনের পর মৃত্যুবরণ করে। প্রজাতির বংশ রক্ষার্থে পুরুষের এরকম আত্মত্যাগ কেবল পরার্থপরতাই প্রকাশ করে।

কর্মী মৌমাছি (Workers)

গঠন: কর্মী মৌমাছি কলোনির মধ্যে সবচেয়ে ছোট আকারের মৌমাছি। এরা বন্ধ্যা স্ত্রী (sterile female) জাতীয় মৌমাছি। এরা কালো বা বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে। এদের দেহ ও পা ঘন সন্নিবিষ্ট লোম বা ব্রিসল দ্বারা আবৃত থাকে। এদের মুখোপাঙ্গ চর্বণ ও লেহন (chewing and lapping) উপযোগী। এদের উদরের শেষ প্রান্তে একটি হুল (sting) থাকে। এদের পশ্চাৎ বক্ষে বিদ্যমান পায়ে রেণু থলি (poollen basket) ও রেণু চিরুনী (pollen comb) থাকে। এদের উদরের অঙ্কীয় দিকে একটি মোমগ্রন্থি (wax gland) বিদ্যমান থাকে।

উৎপত্তি: একটি মৌচাকে কর্মী মৌমাছির সংখ্যা 60,000 থেকে 80,000 পর্যন্ত হয়ে থাকে। নিষিক্ত ডিম থেকে উৎপন্ন হলেও এরা জননে অক্ষম। যেসব লার্ভাকে শ্রমিক মৌমাছিরা মৌরুটি সরবরাহ করে তার পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় কর্মী মৌমাছিতে পরিণত হয়। (মৌরুটি:শ্রমিক মৌমাছির হাইপোফ্যারিনজিয়াল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত পদার্থ, মধু ও নেকটারের সঙ্গে মিশে যে মিশ্র খাদ্য সৃষ্টি হয় তাকে মৌরুটি বা বি ব্রেড বলে)। বৃদ্ধির সপ্তম দিন থেকে এরা মৌচাকের বাইরে আসতে সক্ষম হয়। কেবলমাত্র 20 দিন বয়সের পরেই নেকটার ও রেণু সংগ্রহ করার জন্য এদের উড্ডয়ন শুরু হয়। এরা প্রায় 6 সপ্তাহ বেঁচে থাকতে পারে।

আচরণ: এরা মূলত মৌচাকের পরিচ্ছন্নতা, বাচ্চার যত্ন নেয়া, খাদ্য অন্বেষণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করে। খাদ্য অন্বেষণকারী মৌমাছি মৌচাকের নিকটে দু'ধরনের নৃত্য (চক্রাকার নৃত্য ও ওয়াগল নৃত্য) প্রদর্শন করে অন্যান্য

মৌমাছিদের খাদ্যের উৎস সম্পর্কে অবগত করে। এ নৃত্যকে **মৌমছির ভাষা** (Bee language) বলে। 1947 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী **কার্ল ভন ফ্রিস** (Karl von Frisch) মৌমাছির নৃত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন। এ জন্য এ বিজ্ঞানীকে 1973 খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরষ্কার প্রদান করা হয়।

■ **চক্রাকার নৃত্য** (Round dance): মৌমাছির চক্রাকার নৃত্য কতগুলো বৃত্তাকার গতিপথের সমাহার। এ নৃত্যের মাধ্যমে এরা বাসা থেকে 100 মিটার কম দূরত্বের কোনো খাদ্যের উৎস সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যদের অবহিত করে। তবে এতে খাদ্যের উৎস কোন দিকে তার কোনো নির্দেশনা থাকে না।

■ **ওয়াগল নৃত্য** (Waggle dance): মৌমাছির ওয়াগল নৃত্যে এমন একটি গতিপথ সৃষ্টি হয় যা একটি ইংরেজি '8' এর মতো দেখায়।

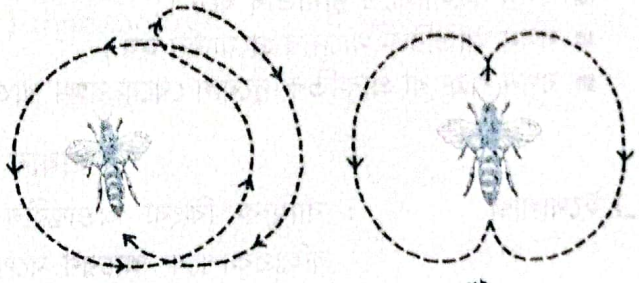

চিত্র ১২.১৩ মৌমাছির (ক) চক্রাকার নৃত্য (খ) ওয়াগল নৃত্য

ওয়াগল নৃত্যের মাধ্যমে মৌমাছি বাসা থেকে 150 মিটার অধিক দূরত্বের কোনো খাদ্যের উৎস সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যদের অবহিত করে। এতে খাদ্যের উৎসের দিক সম্পর্কেও নির্দেশনা থাকে। নৃত্যের পাশাপাশি সূর্যের অবস্থান এবং মৌচাকের সাথে সূর্যের কৌণিক অবস্থান খাদ্যের উৎস ও দূরত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। মৌমাছির উড্ডয়ন বা নৃত্যের সময় এদের ডানার দ্রুত সঞ্চালনে একটি নিম্নমাত্রার (250-300 হার্টজ) শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

কর্মী মৌমাছির কাজ

১। মৌচাক পাহাড়া দেয়া ও অনুপ্রবেশকারীকে আক্রমণ করা।
২। ডানা সঞ্চালন দ্বারা বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করে মৌচাকের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বজায় রাখা।
৩। ব্রুডের বিভিন্ন সদস্যদের যত্ন নেয়া, খাদ্য প্রদান করা, মোম উৎপাদন ও চাক গঠন করা।
৪। খাদ্যের অনুসন্ধান ও অন্যান্য সদস্যদের কাছে তার অবস্থানগত সংকেত প্রদান করা।
৫। রাণীর পরিচর্যা করা। নেকটার, পানি, রেনু ইত্যাদির সাহায্যে মধু সৃষ্টি করা।
৬। পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্য কর্মী মৌমাছিকে হত্যা করা।
৭। প্রোপোলিস (Propolis) উৎপাদন করা।

> প্রোপোলিস হলো রেজিন ও ব্যালসাম (50%), মোম (30%), তৈল (10) ও নেকটার (5%) গঠিত এক ধরনের জৈব যৌগ যা উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত হয়। এগুলো মৌচাকের ফাটল ও ছিদ্র মেরমতেরে কাজে ব্যবহৃত হয়।

কর্মী মৌমাছির মধ্যে অ্যালট্রুইজম সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এরা আমৃত্যু কলোনির স্বার্থে কাজ করে। কর্মী মৌমাছি ঘণ্টায় 15 মাইল গতিবেগে একটানা সর্বোচ্চ 6 মাইল পর্যন্ত উড়তে পারে এবং প্রতিটি ভ্রমণে এরা 50 থেকে 100টি ফুলে গমণ করে। একটি কর্মী মৌমাছি তার সারাজীবনে মাত্র ½ টেবিল চামচ পরিমাণ মধু সংগ্রহ করতে পারে। এক কিলোগ্রাম মধু সংগ্রহ করতে একটি মৌচাকের সকল কর্মী মৌমাছিকে সর্বমোট 90,000 মাইল পথ উড়তে হয়।

কলোনি শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে এরা শত্রুর দেহে হুল ফুটিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। একটি কর্মী মৌমাছি জীবনে একবারই হুল ফুটাতে পারে এবং এরপর মারা যায়। অর্থাৎ এরা কলোনির স্বার্থে জীবন উৎসর্গ করে। এরা কোনো ছোঁয়াচে জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে কিংবা কোনো সংক্রমণ উপযোগী জীবাণু বহন করলে কলোনির স্বার্থে কলোনি ত্যাগ করে একাকী জীবন যাপন করে।

মৌমাছির সোয়ার্মিং বা ঝাঁক বাধা (Swarming)

যে পদ্ধতিতে মৌমাছি প্রাকৃতিকভাবে প্রজাতির সংখ্যাকে বৃদ্ধি করার জন্য মৌচাক থেকে দলবদ্ধভাবে বেরিয়ে আসে তাকে এবং নতুন কলোনি সৃষ্টি করে তাকে **সোয়ার্মিং বা ঝাঁক বাধা** বলে। মৌমাছির ঝাঁক বাধার প্রধান শর্তগুলো হলো:

- যখন রানী ডিম পাড়তে অসর্মথ হয় বা বন্ধ্যা হয়।
- যখন শ্রমিক মৌমাছির সংখ্যা অত্যাধিক বেড়ে যায়।
- যখন মৌচাকের বায়ু চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।
- যখন কলোনিতে স্থানাভাব ঘটে।
- যখন অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়।
- যখন শত্রু বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

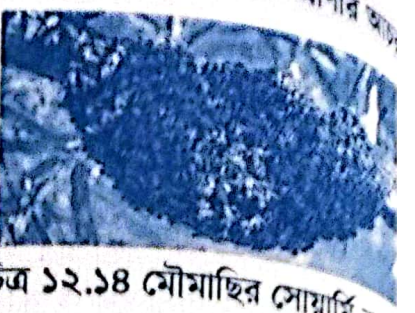

চিত্র ১২.১৪ মৌমাছির সোয়ার্মিং বা ঝ

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

❑ ইথোলজি : বাহ্যিক কিংবা অভ্যন্তরীন উদ্দীপনার কারণে প্রাণিদেহে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় ব বহিঃপ্রকাশকে আচরণ বলে। প্রাণীর আচরণের বিবর্তনিক ও প্রায়োগিক গুরুত্বের বিজ্ঞ ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করার বিজ্ঞানকে ইথোলজি বলে।

❑ উদ্দীপক : উদ্দীপক হলো বহিঃ ও অন্তঃপরিবেশের এমন কোনো পরিবর্তন যা প্রাণীর আচরণে সাড়া সৃ করে। এটি কোনো বস্তু বা ঘটনা বা অন্য কোনো প্রভাবক হতে পারে যা প্রাণী তার সংবে ইন্দ্রীয় দ্বারা গ্রহণ করে।

❑ ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্ন : প্রাণীর জিন নির্ধারিত যেসব আচরণধারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদর্শিত হয় এবং প্রজাতির অ কোনো সদস্যকে না দেখেই বা অন্যের নিকট থেকে না শিখেই প্রকাশিত হয় তা নির্ধারিত ক্রিয়া ধারা বা ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্ন (FAP) বলে।

❑ সহজাত আচরণ : একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রাণী কোনোরকম শিক্ষা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যতিরি জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে বা আত্মরক্ষার তাগিদে বংশ পরম্পরায় একইভাবে যেসব জনুগ অপরিবর্তনীয় আচরণ প্রদর্শন করে তাকে সহজাত আচরণ বলে।

❑ ট্যাক্সিস : সচল গতিময় প্রাণী যখন বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে সুনির্দিষ্ট গতিপথের দিকে চলাচল করে তখন এ ধরনের স্থানান্তরে গমনাগমন জনিত আচরণকে ট্যাক্সিস বলে।

❑ প্রতিবর্ত ক্রিয়া : কোনো সংবেদী উদ্দীপনার প্রতি স্বয়ংক্রিয় ও আকস্মিক সাড়া দেয়াকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে জীবনের জরুরী অবস্থার সাথে মোকাবেলা করার জন্য প্রাণী বিচার বিবেচনা না করে বা উদ্দীপকের ক্রিয়ার ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

❑ অপত্য যত্ন : প্রতিকূল পরিবেশ ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য পিতা-মাতা কর্তৃক ডিম ও অপ (শিশু) সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন করাকে অপত্য যত্ন বা বাৎসল্য আচর বলে।

❑ শিখন আচরণ : প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাণীর যে আচরণ অর্জিত হয় তাকে শিখন বা শিক্ষাল আচরণ বলে।

❑ রাজকীয় জেলি : রাজকীয় জেলি হলো কর্মী মৌমাছির হাইপোফ্যারিনজিয়াল ও ম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি থেকে ক্ষরি ভিটামিন, প্রোটিন ও স্টেরয়েড সমৃদ্ধ এক ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য যা রাণী মৌমাছিকে লা দশায় ও পূর্ণাঙ্গ দশায় খাওয়ানো হয়।

❑ অ্যালট্রুইজম : কতক প্রজাতির প্রাণী সামাজিক আচরণের এক পর্যায়ে স্বজাতীয় অন্যান্য সদস্যদে কল্যাণার্থে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে থাকে। একই প্রজাতি অন্য সদস্যদের প্রতি প্রাণীর এরূপ আচরণকে অ্যালট্রুইজম বলে।

❑ প্রোপোলিস : প্রোপোলিস হলো রেজিন ও ব্যালসাম (50%), মোম (30%), তৈল (10) ও নেকটার (5% গঠিত এক ধরনের জৈব যৌগ যা উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত হয়। এগুলো মৌচাকের ফাটল ছিদ্র মেরমতের কাজে ব্যবহৃত হয়।